এক ব্যাগ মানবতা

প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতা

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

পূর্বকথা

একুশে বই মেলায় ঘুড়ে এলাম কিছুদিন আগে। হাজারো-লক্ষ বইয়ের ভিড়ে রক্তদান সম্পর্কিত কোন বই খুঁজে পেলাম না। রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিতকরণে বইয়ের ভূমিকা অসীম। একুশে বই মেলায়ও এমন কিছু থাকা জরুরী বলে আমি মনে করি।

যেহেতু আমাদের ক্ষমতা সীমিত, সেই সীমিত ক্ষমতা দিয়েই অনলাইন বই / ই-বুক বানানোর প্ল্যান করি। সকল রক্তদাতাদের সহযোগিতায় প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রচুর গল্প পাই এবং সেখান থেকে বাছাইকৃত ১০০ গল্প এই বইটিতে স্থান পেয়েছে। রক্তদাতাদের আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই বইটি একুশে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনলাইনে প্রকাশিত হয়।

এই বইটির পেছনের সকল কারিগরদের আমি আমার মনের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

- সুব্রত দেব (sHuvo Whtevr)
২১.০২.২০১৬

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

উৎসর্গ

- নিজের মূল্যবান সময়
- যাতায়াতের কষ্ট
- যাতায়াত খরচ
- মোবাইলের খরচ
- সূচ ফোটানোর ব্যাথা
- নিজের শরীরের মহামূল্যবান ১ ব্যাগ রক্ত

সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করে একজন রক্তদাতা রক্তদান করেন একজন মুমূর্ষু রোগীকে। বিনিময়ে কিছু পাবার আশায় নয়, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে।

"মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য" - হ্যাঁ, মানবতার শ্রেষ্ঠ উদাহরন হলেন এই রক্তদাতারা।

এই বইটি পৃথিবীর সকল রক্তদাতাদের উৎসর্গ করা হল।

উদ্দেশ্য

প্রথম রক্তদান সকল রক্তদাতাদের জন্য এক বিশেষ ঘটনা। সারাজীবন স্মৃতি হিসাবে ধরে রাখার মত এক ভাল লাগা। ভয় উপেক্ষা করে মানুষের জন্য কিছু করার প্রথম পদক্ষেপ। এই বইয়ে রক্তদাতাদের প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতাগুলো জেনে আরো অনেক মানুষই হয়তো রক্তদানে উৎসাহিত হবে।
এই বইয়ের মাধ্যমে যদি কিছু মানুষও রক্তদানে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে ধরে নিবো।

হ্যাপি ব্লাড ডোনেটিং।

– সুব্রত দেব (sHuvo Whtevr)

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

সূচিপত্র

বিস্তারিত অভিজ্ঞতা পড়তে হলে রক্তদাতাদের নামে ক্লিক করুন

Fahim Bin Faruque
Sabit Mahmud
Touhidul Islam Touhid
Mizanur Rashid Shuvra
রাকিব হাসান অর্ণব
মোঃ আজিজুর রহমান
Emtiaz Ahmed Emu
শহীদুল সারোয়ার সোহেল
Asraf Himal
জান্নাত শতাব্দী
উমর ফারুক ইমরান
Imraan Bin Yousuf
Al Mamun
Emtiaz Rahman
মোহাম্মদ শাহ্-নূর চৌধুরী সুস্ময়
রাকিবুল হাসান রাসেল
ভাবনার সৌকর্য
আশিক আহমাদ
Arman Khann
Muslim Mahmud
Benzamin Rafi
Sabbir Ahmed
আফসানা আজমী
Pavel Babu
A.r. Mahmud Mueid
Ahmed Twaha
Asrap Uddin Asif
আব্দুল্লাহ আল মেহরাব
Khair Amin
মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব সুজন
Humayun Kobir Rubel
SAddam HOssain
Emon Chowdhury
Sazid Bin Zahid
Sabyasachi Chakma
Adrita
Mahadi Hassan
রাজু
অভিশপ্ত তিনান
Mehedi Hasan
Alamin Arafat
Shoeb Ahmed
হিম শুভ্র
তাজনুভা তাসকিন
Niaz Morshed
Mahmud Rafi
Muktara Begum
Nahid Suhan
Himel Maruf
ফাতেমা আক্তার পাখি
মোঃ সামিউল হাসান হিমেল
MD Mamun Hussain
Alif Afsana
Rasel Khan Niloy
Ashraf Bhuiyan Farhad
আদনান রাফিন
SB Prio
Muhammad Abu Shohel
ছগিরুজ্জামান সৈকত
Tanzil Hossain Ali
Goonjohn Rahman
Osman Bin Atique
Shyfullah Tarik
তার বিহীন তবলা
Fahim Rubby
Tetu Deb
Md Nazmus Sakib
Muyeed Jamil
Lima Kabir
Selina Kadir Babli
জুনাইদ রাফিন
Fahmida Ahmed Mou
Riyad Zubair
Ibn Hasan SourAv
Md. Yasin Sheikh
Bibhu Bikol
আলফা বিটা গামা
Muhammad Jasim
Shariful Islam
Kazi Abdul Hamid
Narayan Das
রোহেত আবুতালিব
Sajal Mustafiz
ইমরুল আজিম
Aditi Hossain Anika
Msi Sajib
Jahadul Islam Nerob
Md Mahadi Hasan Sagor
রাশেদ রাহগীর
Md Moshiur Rahman Mim
Madhab Ray Palash
Abdullah Bin Aman Bappy
Rajib Hossain
Fokhor Uddin
অগ্নিঝরা নাজমুল
পাপ্পু রায়
মুহাম্মদ মেহেবুব আলী
K.h. Mohammad Yousuf
Salim
মোঃ আসিফ উর রহমান

তখনও বয়স আঠারোর কোটা পেরোয়নি, বইমেলায় শখ করে রক্তের গ্রুপ জানতে গিয়ে পরীক্ষক এর বারংবার নিশ্চিত হয়ে নেয়া আর তারপর কাছে ডেকে সব রকম ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখার পরামর্শের মোড়কে জানলাম আমি খুব দূর্লভ কোন এক রক্তের বাহক! যে রক্তের রঙ লাল হলেও ঠিক আমার পাশের মানুষটার মতো অতোটা গাঢ় নয় হয়তো!

যাহোক, অন্যান্য দিনের মতোই বিকেলের আড্ডা রেললাইনের ধারে, প্রসঙ্গক্রমে জানলাম বন্ধুর বাবার 'ওপেন হার্ট সার্জারি' করার তারিখ দ্বিতীয়বারের মতো পিছিয়েছে রক্তের অভাবে,গ্রুপ জানতে গিয়ে সেই তথাকথিত দূর্লভ নামটি শুনলাম! নির্দ্বিধায় বললাম, আমিই তো আছি! কখন লাগবে??

পরদিন বিকেলে স্কয়ার হসপিটালের সদর দরজা পেরুতে পেরুতে ভাবছিলাম, মিথ্যে করেই বলব বয়স আমার আঠারো! নইলে হয়তো...

ক্রস ম্যাচিং এর সময়টুকু ধানমন্ডি লেকের পাড়ে বসে বন্ধুটির অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শংকার কথা শুনতে শুনতে কেমন একটা হৃদ্যতায় ডুবে গিয়েছিলাম। অনুভূতিটুকু আরো তীব্র গভীরতা পেয়েছিল সেই বাবার কথায়। রক্ত নেয়ার আগেই আমাকে দেখে বলেছিলেন, তোমাকে আমি ছেলের মতোই জানবো।
রক্ত নেয়া হয়ে গেল, সেই প্রথমবার কিংবা আজকের রক্তদান, কখনোই কোন দূর্বলতা অনুভব করবার কথা মনে পড়ে না। সেদিন তো ফার্মগেট থেকে খিলগাঁও এর পথটুকু অনেকটা হেঁটেই চলে এসেছিলাম! ছেলের দৃষ্টিতে দেখতে চাওয়া সেই বাবা অপারেশনটার পর সপ্তাহান্তে পৃথিবী ত্যাগ করেন কিন্তু তার সেই কথাটুকু, সেই সবুজ জামা, সেই সাদা বেড, সেই দৃশ্যটুকু আমার চোখে আজও অমলিন।

চাইলে অনেক ডাইমেনশন থেকে অভিজ্ঞতাটুকু ব্যাখ্যা করা যায়, জাস্ট এটুকু বলি, সেই দিন থেকে আমি তিন মাস পর পর শুদ্ধ হই। হাসপাতালের মানুষগুলোর অসহায়ত্ব দেখে নিজের সব অপ্রাপ্তি ভুলে কৃতজ্ঞ চিত্তে মাথা নুইয়ে দেই। আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আর চরম দুশ্চিন্তা থেকে খানিকটা সময়ের জন্য হলেও নির্ভার হওয়া স্বজনদের চোখের ভাষা পড়তে পারি। আর খুব কম কাজ আছে আজকের যুগে যা এত কম মূল্যে এতো বেশি কিছু দেয়।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদানের প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল ২০১১ সালে ফাস্ট ইয়ারে কলেজ লাইফে।

তারিখটা ঠিক মনে নেই। প্রতিদিনের মত ক্লাস শেষ করে বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ এক ফেন্ড বলল, চল আজকে একটা ভাল কাজ করবি। এক ব্যাগ বি পজেটিভ রক্ত লাগবে তুই দিবি।

এর আগে কখনো চিন্তাও করিনি আমি আমার রক্ত অন্য কাউকে দিব। নতুন অভিজ্ঞতা পাওয়ার আশায় আমিও রাজি হয়ে গেলাম। হাসপাতালে গেলাম ওই ফ্রেন্ডকে সাথে নিয়েই। মনের মধ্যে অন্য রকম এক অনুভুতি কাজ করছিল যা বলে বুঝানোর মত না। হাসপাতালে গিয়ে রোগী দেখলাম। একজন গর্ভবতী মহিলার জন্য রক্তের প্রয়োজন ছিল। বাথরুমে পড়ে গিয়ে পেটে আঘাত পেয়ে প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। প্রথমে রোগী দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

একজন নার্স এসে বলল, যিনি রক্ত দিবেন তাকে আমার সাথে ডাক্তারের চেম্বারে যেতে হবে।
আমি কিছু না বলে তার পেছন পেছন ডাক্তারের রুমে গেলাম। কলেজ ইউনিফর্ম পড়ে থাকার কারনে ডাক্তার দেখেই বলল, তোমার বয়স ১৮ হয়েছে তো?
রোগী দেখার পর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম আজকে যাই হোক এই রোগীকে আমিই রক্ত দিব। তাই ডাক্তারকে ছোট একটা মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার ১৮ বছর হতে আরো চার মাস বাকি ছিল। ডাক্তারকে বলে দিলাম ১৮ বছর হয়ে গেছে আমার।

প্রথমে গ্রুপ টেস্ট করার জন্য রক্ত নিল। এরপর আমাদেরকে এক ঘন্টা পর আসতে বলল।আমি, আমার ফ্রেন্ড বাহিরে অপেক্ষা করছিলাম। এর মধ্যেই রোগীর বাবা আমার পাশে এসে বসলেন। নিজেই বললেন তার মেয়ের এই দুর্ঘটনার কথা। পেটে আঘাতের ফলে বাচ্চাটা মারা গেছে। এখন শুধু মাকে বাচানো সম্ভব একমাত্র রক্ত দিয়েই। কথাটা শুনার পরেই চোখের কোণে পানি চলে এসেছিল। যাই হোক কথা বলতে বলতে কখন যে এক ঘন্টা পার হয়ে গেল টেরই পাইনি। আমার নাম ধরে ডাকদিল সেই নার্সটি।

আমি ভিতরে গেলাম। একটা বেড দেখিয়ে আমাকে শুয়ে পরতে বলল। আমি শুয়ে পরলাম। সুচটা দেখে প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু পরে কোথা থেকে যেন একটু সাহস এসে জমা হল মনে। ব্যাথা কিছুই মনে হয়নি। পাঁচ মিনিট পর দেখি ব্যাগটা রক্তে ভরে গেছে।
আমাকে বলল, তোমার রক্ত নেয়ে হয়ে গেছে।আর লাগবে না।
এই প্রথম জীবনে রক্তের ব্যাগ দেখলাম। এর আগে যা দেখেছি সব টিভিতে। নিজের রক্তে পূর্ণ ব্যাগটা দেখ সত্যি অন্য রকম এক ভাল লাগছিল। একবার হাতে নিয়েও স্পর্শ করে দেখেছিলাম। প্রথম রক্তদান করলাম বুঝতেই পারছেন মনের অবস্থা। এটা ভেবেও আনন্দ হচ্ছিল যে আমার মত তুচ্ছ একটা মানুষের রক্তও অন্য কারো জীবন বাঁচাতে পারে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেড থেকে উঠার পরই রোগীর বাবা আমাকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। আমি নিজেকে সামাল দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম। বাসায়

ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। মায়ের অনেক বকা খেতে হয়েছিল সেদিন। তারপর ভয়ে মাকে বলিনি যে আমি রক্ত দিয়ে এসেছি। এখন পর্যন্ত ১৯ বার রক্ত দিয়েছি কিন্তু আজও আমার মা জানে না আমি রক্ত দেই।

২০১৩ সালের শেষের দিকে আমার যেই ফ্রেন্ড সেই দিন রক্তদানের জন্য নিয়ে গিয়েছিল, সেই ফ্রেন্ডই এসে বলল আমার জন্য একটা খুশির সংবাদ আছে। সে জানালো আমি যাকে রক্ত দিয়েছি ওই মহিলার নাকি গতকাল একটি মেয়ে সন্তানের মা হয়েছেন। কথাটা শুনে এত ভাল লাগেছিল যে আমি বলে বুঝতে পারব না। ব্যস্ততার কারনে আর খবর নেয়ে হয়নি আমার। দোয়া করি মা, মেয়ে তাদের পরিবার যেখানেই থাকে ভাল থাকে।

আজও স্মৃতির মনিকোঠায় জীবনের প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতা অমলিন হয়ে আছে এবং থাকবে।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

জীবনটা ছিলো অন্যরকম। নতুন জীবনের আবির্ভাব এই রক্তদানের মাধ্যমে।

কেউ একজন আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! সুইসাইড করতে ইচ্ছা হচ্ছে! সুইসাইড ছাড়া আর কোন পথ খুজে পাচ্ছেন না? সুইসাইড না করে একটা মানুষের জীবন বাচানোর জন্য যেখানে এক ব্যাগ রক্ত দরকার সেখানে গিয়ে ১ব্যাগ রক্ত দিয়ে আসুন। দেখবেন সুইসাইড এর ইচ্ছা এক নিমিসেই চলে গেছে ।।।।
কি বিশ্বাস হচ্ছেনা!!

তাহলে শুনেন আমার ১ম রক্তদানের পরের নতুন জীবন।

৭ সেপ্টেম্বর আমার জীবনের একটা খুব মুল্যবান জিনিস আমি হারিয়েছি। সেটা ছাড়া একসময় আমার জীবন চলতোনা। হে ঠিকই ধরেছেন। আমার একসময়ের মনের মানুষ, আমার প্রিয়তমা। কোন একটা কারণে সবকিছু উল্টাপাল্টা হয়ে গেলো। ১সপ্তাহ আমি আমার মধ্যে ছিলাম না। সুইসাইড ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিলো না। হঠাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর ফেইসবুক থেকে খোঁজ পেলাম চট্টগ্রামে এক ব্যাগ B+ রক্ত দরকার। চিন্তা করলাম সুইসাইড করে মরবোই যখন একটা মানুষকে এক ব্যাগ রক্ত দিয়েই যাই। কনফার্ম করলাম রাতে। পরেরদিন চলে গেলাম চট্টগ্রাম মেডিকেলে। আমার আম্মুর বয়সী একটা আন্টির অপারেশন হবে। রক্ত দরকার। দিয়ে দিলাম রক্ত। কোন প্রকার ভয় ছাড়াই। কারণ তখন আমার হারানোর মতো ছিলো না।

রক্তদানের পরে ওই আন্টির ছেলের মুখের হাসি দেখে আমার সুইসাইড এর ইচ্ছা মিটে গেলো। চিন্তা করলাম আমার ১ব্যাগ রক্ত যদি এই অচেনা একজন মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে পারে তাহলে ওই একটা মেয়ের জন্য, একটা বিশ্বাসঘাতকের জন্য কেনো আমি সুইসাইড করবো। এর পরেই আমার মধ্যে পরিবর্তন আসা শুরু হলো। আমার মায়ের জন্যও তো রক্ত লাগতে পারে কোন সময়, আমার মায়ের জন্য হলেও আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমার মাকে রক্তদান করে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হলেও আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। তখন থেকেই আমি ৪ মাস পর পর নিয়মিত রক্তদান করি। ৫ বার সম্পূর্ণ করেছি। ইচ্ছা আছে সেঞ্চুরি করার।

এছাড়াও ফেইসবুকে অন্যকে রক্তদানে উৎসাহিত করি, অন্যজনকে দরকারের সময় রক্তদাতা খুঁজে দিতে সাহায্য করি। এটাই হচ্ছে এখন আমার বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন।

রক্তদাতাঃ Mizanur Rashid Shuvra অভিজ্ঞতাঃ ৪ (সূচিপত্র)

১৯৯৮ সালের সে দিনটি ছিল আমার জন্মদিন। ছোটো বেলায় জন্মদিনে আমার মা-বাবা অসহায় মানুষদেরকে খাওয়াতেন। আর তখন থেকেই ধারনা হয়, জন্মদিনে কেক কেটে আনন্দের চেয়ে বেশি তৃপ্তি পাওয়া যায় অন্যের মুখে হাসি দেখে। বড় হবার পর জন্মদিন তেমন আর পালন করা হয়নি। এখন বাবা মায়ের থেকে অনেক দূরে কিন্তু সেই ১৯৯৮ সালের দিন গুলোর কথা মনে আছে এখনো।

আমার জন্মদিন। রিকসায় করে মোহামাদপুরের পুরানো থানা রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম রেড ক্রিসেন্টের অফিসের সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ১১/১২ বছরবয়সী এক মেয়েকে নিয়ে এক মহিলা মুখ আঁচলে ঢেকে কাঁদছে। রিকসা থামিয়ে জানতে চাইলাম- কি হয়েছে? মহিলা মুখে কাপড় রেখেই জানালেন তার মেয়ে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রন্ত। তাকে নিয়মিত রক্ত দিতে অনেক দূর থকে আসতে হয়। আর আজকে এতদূর থেকে এসেও এখানে রক্ত পাচ্ছেন না। তার AB+ রক্ত প্রয়োজন শুনে মনের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল! এ তো আমার রক্তের গ্রুপ! আমি জীবনে কোন দিন রক্ত দেইনি ঠিকই তবে অনেককে রক্ত দিতে দেখেছি।

তখনই মনে আজ জন্মদিনে একটা ভালো কাজ করার সুযোগ, এর থেকে ভালো কাজ আর কি হতে পারে! আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কি রক্ত দেওয়া যায়? চলেন তো দেখি। উত্তরে উনি শুধু বললেন, বাবা এনারা ভালা মানুষ, রক্ত থাকলে আমার মাইয়ারে ফেরায় দিত না, গিয়া লাভ হইব না।
আমি বললাম, আমাকে নিয়ে চলেন, দেখা যাক।

উনি আমকে ভিতরে নিয়ে ডাক্তারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি ওনাকে বললাম- "আমার রক্তের গ্রুপ AB+ বলেই জানি, আবার একটু টেস্ট করে দেখ যাবে কি? মিলে গেলে আমিই মেয়েটার জন্য একব্যাগ রক্ত দিতে চাই।" ডাক্তার অনেক খুশী হয়ে গেলেন। আঙুল থেকে চট করে এক ফোটা রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে জানালেন- "হ্যাঁ, আপনার গ্রুপ ঠিক আছে কিন্তু আপনার প্রেসার আর ওজন দেখতে হবে"। সেটাও দেখা শেষে জানালেন- "আপনি রক্ত দিতে পারবেন। আসুন আমার সাথে"। আমার অবশ্য তখন আসন্ন সুঁইয়ের গুঁতোর ভয় ছাড়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের আর কোন অনুভূতিই কাজ করছিল না। তারপর হঠাৎ চোখে পরল- অনেকেই শুয়ে আছে সুঁই হাতে। এমনটা যে আগে দেখিনি তা না। কিন্তু আজকে আমিও সেই দলের হতে যাচ্ছি যারা অন্যের কারণে নিজে কষ্ট পেতে ভালোবাসে। প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির কাজেই যদি না লাগলাম তাহলে ভালো কাজের হিসেব কি দিব? এমনটা ভাবতে ভাবতেই নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পরলাম রক্তদানের বিছানায়। চোখ মুখ বন্ধ করে হাতে ধরিয়ে দেওয়া কাঠের টুকরাটা চাপ দিয়ে ধরে থাকলাম। আমার এই অবস্থা দেখে ডাক্তার হাসে। এজন্য আবার আমার একটু সন্দিহান সাহসিকতায় আঘাত লাগে। এমন সব ওলটপালট চিন্তা করতে করতে কখন যে সুঁইটা হাতে ঢুকে গেল বুঝতে পারলাম না! ডাক্তার শুধু বললেন- "বাহ আপনার রক্ত তো বেশ টকটকে লাল! চোখ খুলে সাহস করে দেখুন না একবার!" আমিও চোখ খুলে দেখলাম, রক্ত জমে ব্যাগ ভরে যাচ্ছে! আমার শরীরের একটা কিছু স্থানান্তরিত হবে অন্যকারো শরীরে, একটা মায়ের মুখে হাসি ফুটবে, আরেকটা জীবনের কিছু দিনের হয়তো বাঁচার সুযোগ করে দিবে। এমন এক তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে বিনা অহংকারে সারা জীবন বেঁচে থাকা যায়।

৬ই সেপ্টেম্বের সেই মায়ের মুখের হাসি আজও আমার মনে আছে। থাকবারই কথা, মানুষ হয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষের ভিতরে বেঁচে থাকার তৃপ্তি পাওয়ার সুযোগ খুব কমই হয়। রক্তদান এমনই এক সুযোগ। এর পর রক্ত দিয়েছি প্রায় আরো ১০ বার। হয়তো কোন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে পুরো এক পরিবারের মুখে হাসি ফুটেছে!

আমি শুধু জানি যে- মানুষের রক্তের মতো এমন মূল্যবান বস্তু কখনই বিফলে যায় না। আসুন আমরা সবাই একটু অন্যের জন্য বাঁচতে চেষ্টা করি।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ রাকিব হাসান অর্ণব অভিজ্ঞতাঃ ৫ (সূচিপত্র)

৭ এপ্রিল, ২০১৫।

খুব ভোরে জরুরী ফোন পেয়ে গেলাম আগারগাও নিউরোসাইন্স হাসপাতালে। সেখানে ৮ মাসের এক বাচ্চার জন্য ৭০০ মিলি এবি নেগেটিভ রক্ত দরকার। যেহেতু আমার রক্তের গ্রুপের সাথে মিলে গেছে, সেহেতু আমি এক ব্যাগ দিলাম।

পরে ডাক্তার এসে বললেন আরো প্রায় ২৫০মিলি রক্ত লাগবে ইমারজেন্সী। কোথাও রক্ত না পেয়ে বাচ্চাটার বাবা কান্নায় ভেংগে পড়লেন। এদিকে ডাক্তার রক্তের জন্য বার বার চাপ দিচ্ছেন। তারপর ডাক্তারকে আমি বললাম, আমি বাকি ২৫০ মিলি রক্তও দিব। হাসপাতালের কেউ তাতে রাজি না, যেহেতু এমনিতেই আমার ওজন কম। মাত্র ৫৫ কেজি। কোন উপায় না পেয়ে আমি বারবার ডাক্তারকে বিরক্ত করতে থাকলাম।

ডাক্তারও পিচ্চি বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় ছিলেন, তাই না চাইতেও রাজি হল রক্ত নিতে। অবশেষে রক্ত দিলাম। অপারেশনও সাকসেসফুল হল। আমাকে নিয়ে সবাই চিন্তিত। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

জানিনা এখন পর্যন্ত কেউ একসাথে এক ব্যাগের বেশি রক্ত দিয়েছে কিনা, কিন্তু আমি ঝুকি না নিলে হয়তো বাবুটা এখন জীবিত নাও থাকতে পারত। হে আল্লাহ, আমাকে সবসময় স্বেচ্ছায় রক্ত দান করার তওফিক দান করুন। - আমিন

রক্ত দিন, গৌরব বাঁচান

গল্পটা ঠিক ২০১১ সালের শেষের দিকে।
একদিন বিকালে মনটা খারাপ থাকায় কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে মিরপুরের দিকে গেলাম । এবং ওখানে এক স্যারের বাসায় গেলাম এবং গল্প করছিলাম। হঠাৎ এক পর্যায়ে স্যার বললেন তার এক বন্ধুর জন্য এবি নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন।
আমি বললাম, স্যার আমি দিবো।
- আচ্ছা তাহলে আজিজ তুমি দিও প্লিজ।

যথাসময়ে আমাকে এক ভদ্রলোক ফোন দিলেন তিনি জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালের একজন ডাক্তার, উনার স্ত্রীর জন্যই ব্লাড লাগবে।
লোকটি বললো, আমি আপনার স্যার এর বন্ধু। কাল ব্লাড লাগবে ভাইয়া। তোমার আপুটাকে একটু বাঁচিও।
বললাম আমি, ভাই, বাঁচানোর মালিক আল্লাহ। আমি কাল আসছি ১১টার দিকে।

আমার ক্যাম্পাস থেকে হাসপাতালটা কাছে থাকায় ১১টার মধ্যেই চলে আসলাম। আমাকে দেখে ওনি অবাক কেননা তখন ওজন কম ছিল, মাত্র ৪৯ কেজি ২০ গ্রাম। পাশের অন্য এক ডাক্তার বললো, তুমি দিতে পারবে না ।

তখন ঐ রোগীর স্বামীর মুখটা দেখলাম কালো হয়ে গেল। চোঁখে পানি জমে গেল। আমি তখন তার এই অবস্থা দেখে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না।
একটা সাদা কাগজে লেখলাম "যদি এই রক্তদানের ফলে কোন সমস্যা হয় অথবা আমি যদি মারাও যাই, তাহলে রোগীর আত্বীয় ও হাসপাতালের কেউ দায়ী থাকবে না। এটা আমার ইচ্ছাতেই হয়েছে। - ইতি আজিজ "

তারপর আমার কান্ড দেখে ওনারা রক্ত নিলেন এবং আমার কোন সমস্যাও হয়নি। ভালোই লেগেছে রক্তদান করতে। তারপরের দিন খবর পেলাম তাদের একটি মেয়ে হয়েছে ।

ভেবেছিলাম মেয়েটাকে কিছু উপহার দিবো কিন্তু ওনারা দেখা করতে চাচ্ছেন না আমার সাথে। মাঝে মাঝে আমিই ফোন করে বাচ্চাটার খবর নিতাম।

একদিন ক্যাম্পাসের এক আপু রক্ত পরীক্ষার দরকার ছিল। তখন ঐ ডাক্তার ভাইয়াকে ফোন করি। তখন অবাক হলাম উনি ফোন রিসিভ করেই বলছেন, হ্যালো কে?
বললাম, আমি আজিজ ভাইয়া!
- কোন আজিজ ?
বললাম, আমি ঐদিন আপনার স্ত্রীকে ব্লাড দিয়েছিলাম ভাইয়া।
ভদ্রলোকটি বললো, ও আচ্ছা ভালো আছো?
- জ্বী ভাইয়া। আপনি ও বাবু ভালো আছে?

- হ্যাঁ, সবাই ভালো। কিছু বলবে আজিজ?
ভাইয়া আপনি তো হৃদরোগ হাসপাতালের ডাক্তার। আমার এক ছোট বোনের ব্লাড এর গ্রুপটা পরিক্ষা করাবো। যদি আপনি ওখানের লোকদের একটু বলে দিতেন তাহলে একটু তাড়াতাড়ি পরিক্ষাটা করতে পারতাম!
- আমি তো ওখানে নেই এখন, একটা কাজ করো তুমি তোমার বোনকে নিয়ে আমার চেম্বারে এসো। মিরপুরে আমার চেম্বার। আসার আগে একটা ফোন দিও। ফ্রী করিয়ে দিবো!
কথা হবে বলে ফোনটা কেটে দিল। তারপরও উনাকে কয়েকবার ফোন দিয়েছি। আমার নাম্বারটি ব্লাক লিষ্টে রেখে দিয়েছিল।
এরপর থেকে আমিও আর তার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ রাখিনি ।

একটা কথাই শেষে বলতে চাই যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে, তারা অনেক মূল্যবান। তাদের সম্মান না করুন, অন্তত একটু ভালোবাসুন।

রক্তে মোরা বাঁধন গড়ি
রক্ত দিবো জীবন ভরি

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

বইমেলার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম কার্জন হলে বাস ধরতে। বইমেলায় কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের লোকজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনকে মোটিভেইট করার চেষ্টা করছিল। এর মাঝখানে আমি সামনে গিয়ে বললাম, রক্ত দিব। ভলান্টিয়ার বোধহয় একটু অবাকই হলেন। এতক্ষণ তিনি লোকজনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রক্তদানে রাজি করছিলেন, আর আমি কিনা সোজা গিয়ে রক্ত দেয়ার কথা বলছি। যাই হোক, রক্ত দিলাম। এরপর বেডে শুয়ে চিন্তা করছি, আমার এখন মাথা ঘোরাবে, জ্বর জ্বর লাগবে। কিন্তু কিসের কি! বেড থেকে নেমে দেখি বাস ছেড়ে দেয়ার বাকি আর মাত্র ৮ মিনিট। ঝেড়ে দৌড় দিলাম। এটাই ছিল প্রথম রক্তদান।

হয়তো সেই সংগঠন ছিল কোয়ান্টাম বা ঢাকা ব্লাড ব্যাংক। সবুজ লিকুইডটা খেতে বেশ মজা ছিল।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

মা অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি। রক্তে হিমোগ্লোবিন কম। জরুরী ভিত্তিতে এবি পজেটিভ রক্ত লাগবে।

আমি দিবো।
কিন্তু তখনও জানতাম না যে, আমার আর মায়ের রক্তের গ্রুপ এক না।
মায়ের প্রয়োজনে রক্তদান করতে পারি নাই।

ওয়াদা করলাম, রক্তের প্রয়োজনে আমার ঘোরতর শত্রু এলেও সামর্থ্য থাকলে, আমি তাকে ফিরিয়ে দিবো না।

এই ঘটনার ২ বছর পরে এ পজেটিভ রক্তের রিকুয়েস্ট আসে। রাত ১২টায় টঙ্গী থেকে ছুটে যাই লালমাটিয়ার সিটি হাঁসপাতালে।
হতাশ হলাম।
কারণ, ইনফরমেশন ভুল। রোগী বি পজেটিভ রক্তের ধারক।

সপ্তাহখানেক পরে আবার রিকুয়েস্ট আসে।
ধানমন্ডির ল্যাব ওয়ান হাসপাতালে ০৪/০২/২০১২ তারিখে আমি আমার ১ম রক্তদান করতে পেরেছি।

রক্তদানের পর নিজেকে নতুন করে আবিস্কার করলাম। রক্তদানের মত মহান কাজ আমার মত নগণ্য এক মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। মানুষের জন্য নূন্যতম কিছু হলেও করতে পেরেছি। নিজেকে মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

ইনশাল্লাহ, রক্তদানে সেঞ্চুরি করবো।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

২০ জুলাই ২০০৯ সাল, সোমবার
আমার এক প্রিয় বন্ধু আরিফ এর জন্মদিন, তাই আরিফ এর বাসায় যাই তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। আরিফ এর বাসা থেকে বের হয়ে বাজার করছিলাম,কারন তখন বাড়ির বাজারটা মাঝে মাঝে আমি করতাম।
যাই হোক, হঠাৎ অপু ভাই ফোন দিলেন (অপু ভাই তখন নরসিংদী জেলা রেড ক্রিসেন্ট এর রক্ত বিভাগীয় প্রধান, আমি ও রেড ক্রিসেন্ট সদস্য), হিমেল রক্ত দিতে হবে এক বাবাকে, ওপেন হার্ট সার্জারি হবে রাতে। ৭ ব্যাগ রক্ত লাগবে কিন্তু ডোনার মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে।

অপু ভাই বললেন, এখন তুই ভরসা। আমি বললাম, আমি দিব রক্ত।
তখন অপু ভাই বলেন, বাজার করে বাড়ি যা, গোসল করে খেয়ে চলে আয় পাঁচদোনা,এ খানে গাড়িতে আমরা থাকবো।
জানতে চাইলাম, কোথায় দিব রক্ত।
ওনি বললেন, ঢাকা।
আমি চিন্তায় পরলাম, কারন জীবনে প্রথম রক্ত দিব এই আনন্দ, আবার ঢাকা যেতে হবে। যাই হোক বাড়ি গিয়ে আম্মাকে জানালাম। আম্মা এক কথায় বলেন, তাড়াতাড়ি যাও, কিছু হবে না।
সাহস বেড়ে গেল।

চলে গেলাম স্বপ্ন পূরন করতে,জীবনের প্রথম রক্ত দানের জন্য। নরসিংদী থেকে আমরা ৭ জন ডোনার যাই ঢাকা, রোগী বয়স্ক এক জন ভদ্রলোক। মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন। আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসে, মনে হচ্ছিল যদি কয়েক ব্যাগ রক্ত দিতে পারতাম!

শুরু হলো আমার রক্তের পরীক্ষা। এক সময় সকল বাধাকে পিছনে ফেলে জীবনের প্রথম রক্ত দান করে ফেললাম আর ভাবতে থাকলাম, কেন আরও আগে অপু ভাই ফোন দিলনা!

রক্ত দিয়ে বাড়ি আসলাম রাত প্রায় ১টার দিকে, তাও আবার ২-৩ কিলোমিটার রাস্তা একা হেটে। আম্মা অনেকটা চিন্তায় ছিলেন, কিন্তু আমায় কিছু না বলে প্রথমে জানতে চাইলেন রোগী কেমন আছে।

এর পর থেকে আমি নিয়মিত রক্ত দান করি, এখন পযন্ত ১৫ বার হলো। যতদিন পারি রক্ত দিয়ে যাব।

ধন্যবাদ জানাই আম্মাকে এক কথায় রক্ত দানের জন্য সাহস যোগানোর জন্য।
অপু ভাইকে ধন্যবাদ জানাই প্রথম রক্ত দানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

ডিসেম্বরের দশ তারিখ। সকাল দশটা। ফুফা এসে বলল, তোর ব্লাড গ্রুপ কি? আমি বললাম, ও পজেটিভ। ফুফা বললো, তোর ভাইয়ার বন্ধুর বউয়ের সিজারের সমস্যা, তাই রক্ত লাগবে হয়তো। আমি শুয়ে ছিলাম, লাফ দিয়ে উঠে বললাম, আমি দিব আমি দিব! ফুফা বললো পরে ফোন করে ভাইয়া জানাবে।

হুট করে নিচে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডাকছে। আমি পড়ি কি মরি কোনোমতে মুখটা ধুয়ে নিচে নামলাম। একা যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না পথে "উনাকে " পিক করে নিলাম। মজার ব্যপার + ভয়ের ব্যাপার ছিল আমি আমার ব্লাড গ্রুপ টেস্ট করি নাই, বাসার সবার ও পজিটিভ, সেই হিসাবে আমারটাও আন্দাজি ধরা।

গাড়িতে বসেই ওকে বিষয়টা মেসেজ বক্সে লিখে দিলাম। ও তো আমার চেয়েও গেলো ভড়কিয়ে গেল। মনে মনে দুয়া দুরুদ পড়ছিলাম, আল্লাহ মান ইজ্জত বাঁচাও। গ্রুপ যাতে ও+ হয়। লাগলে আমার যদি অন্য গ্রুপও হয় অন্তত আজকের জন্য রক্ত বদলিয়ে ও পজিটিভ বানিয়ে দাও।

গেলাম, রক্ত পরীক্ষা করলো। আর তো টেস্ট রিপোর্ট আসে না। আমি ভয়ে শেষ! আজকে কি মান সম্মান আদৌ থাকে কিনা। আম্মাকে ফোন দিলাম, জিজ্ঞাস করলাম আম্মা, আমার ব্লাড গ্রুপ কি? আম্মা বলল, ও পজিটিভ। আমি বললাম, কবে টেস্ট করা হইছিলো? আম্মা বলে, টেস্ট তো করাই নাই আমাদের সবার যা তোর ও তো তাই হবে। আমি দিলাম কল কেটে। আর যত দুয়া দুরুদ পারি পড়তেছিলাম।

অবশেষে সেই রিপোর্ট আসলো এবং গ্রুপ মিললো। প্রানে বাঁচলাম আমরা। তারপর আর কি! সেই যন্ত্র আতি! এমন অবস্থা যেন সিজার আমার হইছে। কেউ ডাব আনে, কেউ জুস, কেউ গ্লুকোজ। ভাইয়ার বাসায় গেলাম। চাইনিজ খাওয়ালো। বিকালে একদম বাসায় নামিয়ে দিয়া গেলো। রক্তদানও হইল + ফুলডে ডেটও।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

ছোটবেলা থেকেই মনের ইচ্ছা, মানুষের উপকার করব। যখন সুযোগ হয় করব, যেভাবে সুযোগ হয় করব। যতটুকু পারি অন্তত ততটুকুই করবো। নাহ! নিজেকে মহান প্রমাণ করার বলছি না, ঘটনা সত্যি।

একটু বড় হয়ে বুঝলাম, জীবনটা খুব কঠিন। বাস্তবতার আকাশে শুভ্র গাংচিল উড়ে বেড়ায় না, সেখানে কদাকার বাদুড় আর শকুনের উড়াউড়ি! মানুষের উপকার করার যে মহান ইচ্ছা নিয়ে বড় হয়েছি, সেটা অনেকটা চুপসে গেল।

বুঝ হবার পর আশেপাশে অনেক মানুষকে দেখতাম, তারা তাদের রোগীর জন্য পেরেশান হয়ে রক্ত খুঁজছে। ব্লাড ব্যাংকে ছুটাছুটি করছে। অনেক চড়া দাম, তবু অনেক সময় রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে ভয়াবহ পরিস্থিতি!
এসব রোগীর আত্মীয়দের মানসিক অবস্থা কেমন হয়, সেটা আমার উপলব্ধিতে আসেনি কখনো। ২০১০ সালে আমার এক মামা শট সার্কিটে দগ্ধ হন। মামার চিকিৎসার জন্য তখন প্রচুর রক্ত প্রয়োজন। মামার বন্ধুবান্ধব, কলিগ সবাই প্রাণপণে ছুটাছুটি করে একের পর একে ডোনার খুঁজে এনেছিলেন। প্রায় ৪০+ ব্যাগ রক্ত দেয়া হয় মামাকে। তবুও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

যাইহোক, ওই ঘটনার পর থেকে মুমূর্ষু রোগীর রক্তের প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়দের অবস্থা কেমন হয়, সেটা আমার জানা হয়ে যায়। মনে মনে বলি, যদি কখনো সুযোগ আসে আমিও ইনশাআল্লাহ রক্তদান করব। কিন্তু মনের মধ্যে ভীষণ ভয়ও কাজ করত।

ফেসবুকের কল্যাণে রক্তদান নিয়ে কাজ করা অনেক ভাইবোনের সন্ধান পাই। তাদের আপডেট আর নিউজ ফিড দেখে দেখে আমার মনের ইচ্ছেটা ডালপালা মেলে বিস্তৃত হতে থাকে। ভয়টা কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে সেখানে সাহসেরা আস্তানা বাঁধা শুরু করে।

এক মাস পরের কথা। হঠাৎ একটা কল আসে আমার মোবাইলে। রিসিভ করতেই ওপাশের লোকটা আমার নাম জিজ্ঞেস করে বললেন, 'আপনি কি আজ মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে রক্তদান করতে পারবেন? একজন ক্যান্সার আক্রান্ত বাবার জন্য ও পজেটিভ ব্লাড লাগবে।' আমি দুই সেকেন্ড চিন্তা করে বললাম, 'হ্যাঁ পারবো। কখন আসতে হবে?' উনি বললেন, 'এখন চলে আসতে পারলেই ভালো হয়। যত দ্রুত সম্ভব।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমি আসছি। এসে ফোন করব।'

আমি তখনই 'বাকি ক্লাস গোল্লায় যাক' ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। মহাখালী যাবার বাসে উঠে পড়লাম। বুক দুরুদুরু কাঁপছে। মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নেমেই ফোন দিলাম ওই নাম্বারে। উনি এসে আমাকে রক্তদানের কক্ষে নিয়ে গেলেন। রক্তদানের জন্য শুয়ে মনে হলো, ইশ! কেন যে মানবতা আর দরদ দেখিয়ে আসতে গেলাম এখানে? ভয়ে কান্না আসার উপক্রম হল!

ডাক্তার অভয় দিয়ে বললেন, 'সামান্য ব্যথা হবে। চিমটি কাটার মত। আপনি টের পাবার আগেই শেষ হয়ে যাবে।' একথা বলে উনি আমার হাতে ভেইন খুঁজতে লাগলেন। আমার তখনই হুট করে শুভ ভাইয়ের একটা পোস্টের কথা মনে পড়ে গেলো, "যখন রক্ত নেয়ার জন্য সুঁচ ঢুকানো হবে তখন মাইন্ড অন্যকিছুতে ডাইভার্ট করে ফেলবেন। তাহলে সুঁচ কখন ঢুকালো, কী করলো কিছুই বুঝতে পাবেন না। তা যদি না পারেন, অন্যদিকে ফিরে খুক করে একটু কাশি দিবেন তাহলেও ব্যথা টের পাবেন না তেমন।" আমি সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে খুক করে একটা কাশি দিলাম, এদিকে কুটুস করে সুঁইটা আমার হাতের মধ্যে সেঁধে গেল। তেমন কোন ব্যথা পেলাম না দেখে নিজেই আশ্চর্য হলাম!

মাত্র তিন মিনিট হয়েছে কি হয়নি, ডাক্তার বললেন- আর পাঞ্চ করতে হবে না। ব্লাডব্যাগ ভরে গেছে। আমার মনে হল, এক মহা অসাধ্য সাধন করে ফেলেছি! ডাক্তার সুঁই খুলে আমাকে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে বললেন।

চুপচাপ বেডে শুয়ে আছি। রোগীর ছেলে যিনি আমাকে ফোন করেছিলেন, উনি বললেন- 'আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব বুঝতে পারছি না। আমার বাবা (উনি বাসায় ছিলেন) আপনার সাথে কথা বলতে চান।' আমার চোখ ভিজে উঠল কেন যেন। আমি মোবাইলটা কানে চেপে ধরতেই ওপাশ থেকে একজন বয়স্ক মানুষের কৃতজ্ঞতা ঝরা কন্ঠ ভেসে এল। আমি লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম। আংকেল বললেন, 'তুমি নাকি ছোট একটা ছেলে। আমাকে রক্ত দিতে এসেছ। কে তুমি বাবা? তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।' আমি আনন্দে কেঁদে ফেললাম। বললাম, 'মনে করুন আমি আপনার এক ছেলে। ছেলে বাবাকে রক্ত দিবে, এটাই স্বাভাবিক।' এর মাঝেই আংকেলের হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে আন্টি বলা শুরু করলেন, 'বাবা তুমি যেই হও না কেন, (উনার ছেলের কথা বললেন) ওর সাথে বাসায় চলে আসো। তোমার সাথে বসে এক বেলা খাবার খাব। এখনই চলে আসো।' মায়ের মমতায় আমার ভেজা চোখ আবার ভিজে উঠল। এইসব ভালোবাসা কিভাবে উপেক্ষা করতে হয় আমার জানা নেই। খুব কষ্টে বললাম, 'আন্টি আমি ক্লাস ফেলে এসেছি। এখন গিয়ে আবার ক্লাস ধরতে হবে। আরেকদিন এসে অবশ্যই খেয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।' অনেক জোরাজুরি করার পর উনাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। এরপর উনার ছেলের সাথে যেন কী কী কথা বললেন। উনি ফোন রেখে বললেন, 'আব্বা আপনাকে দেখতে চায়। যেহেতু আপনাকে বাসায় নিতে পারলাম না, আপনার ছবি নিয়ে যেতে বলেছে।' আমি আরেকবার ভালোবাসার বৃষ্টিতে সিক্ত হলাম। আমার ফোন থেকে ২-৩টা ছবি উনার মোবাইলে পাঠিয়ে দিলাম।

একটু পর বিছানা থেকে উঠে দেখি পাশের টেবিলে আপেল, কমলা, আঙ্গুর, জুস, ডাব, বিস্কিট আরও কী কী যেন।!আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এসব কী?? উনি বললেন, এখন আপনার শরীরে দ্রুত কিছু এনার্জি প্রয়োজন। কিছু খেয়ে নিন। তারপর জোরাজুরি করে কমলা, বিস্কিট আর জুস খাইয়েই ছাড়লেন!
চলে আসব, এমন সময় দেখি উনি নিজের হাত মুঠ করে ধরে আমার হাত বাড়াতে বলছেন সামনে। আমি তো বুঝে গেলাম ঘটনা কী। হায় হায় করে উঠে বললাম, 'আপনি কি চান, এই যে ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে পেলাম সেসব আমি ভুলে যাই? বা যে মহান নিয়ত নিয়ে এখানে এসেছি সেটা নষ্ট হয়ে যাক? যদি না চান, প্লিজ এটা করবেন না। আমি খুবই বিব্রতবোধ করছি।' উনি সামান্য হেসে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

সেদিনের পর আরও মোট চারবার রক্ত দিয়েছি। কিন্তু প্রথম অভিজ্ঞতার কথা ভুলার নয়। এখন তো রক্তদান করাটা নেশার মত হয়ে গিয়েছে। ৩-৪ মাস হয়ে যাওয়ার পর রক্ত না দিতে পারলে অস্থির লাগতে থাকে।

রক্তদান করার পর আমার উপলব্ধিতে পরিবর্তন এসেছে। এখন আমি জানি, মানুষের উপকার করতে চাইলে অনেক বড়লোক হতে হয় না। শুধু একটা বড় মনের দরকার হয়। সুঁইয়ের একটা খোঁচা, বিনিময়ে একটা জীবন। ভাবা যায়?
যারা এখনো রক্তদান করেননি, তাদের বলছি- অল্প একটু সাহস সঞ্চয় করে রক্তদান করে ফেলুন। দেখুন, কী অপার্থিব আনন্দ! একবার রক্তদান করে ফেললে এরপর দেখবেন আপনি নিজেই পাগল হয়ে রক্তদানের জন্য রোগী খুঁজতে থাকবেন।

'নিজের রক্ত বইছে অন্যের শিরায়, মানবতার এইতো পরিচয়।' ... হ্যাপী ব্লাড ডোনেটিং!

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Imraan Bin Yousuf অভিজ্ঞতাঃ ১২ (সূচিপত্র)

দেশের বাইরে থাকতেই ফেইসবুকে রক্ত ম্যানেজ করে দেয়ার চেষ্টা করতাম। ভাল লাগত। একসময় দেশে ফিরলাম। নিয়ত করেই এসেছি রক্ত দান করবো।

৩ জানুয়ারি, ঠিক বিকালে এক ভাই ফোন দিলেন, একজন সিজারের রোগীর জন্য রক্ত দরকার। ইমার্জেন্সী। খুশিতে নেচে উঠলাম। সাইকেল নিয়ে প্রায় ৩/৪ কি.মি দূর চলে এলাম। কিন্তু ব্লাড দিতে গিয়ে হলো ঝামেলা, আমার ভেন খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই হাতে ৪ বার শক্ত করে ফিতা বাধা হলো। উহু, কোন ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে না। "ইভেন ফিউচারে আপনার সিরিয়াস ইঞ্জুরি হলে আমার মারাত্মক ক্ষতি হবে এই ভেইন খুজে না পেলে" - এই বলে লোকটি চলে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, ভাই দাড়ান। ফিউচারে কি হবে সেটা বাদ। ফিতা আরো শক্ত করে বাঁধেন, চামড়ার ছাল উঠে গেলে যাক, ভেইন বের করেন আর রক্ত বের করেন। প্রথম বার রক্ত দিচ্ছি বলে এক্সাইটেড না, আগে এক মায়ের জীবন বাঁচান।
ব্যাস! ৫ম বারেই ভেইন খুঁজে পেল। এরপর মোটা সুঁই প্রথম বার মাংসে ঢুকিয়েছে, পরে বের করে ভেইনে ঢুকিয়েছে। একটুকুও কষ্ট পাইনি। জাস্ট ঘেমে গিয়েছিলাম এই ভেবে যে রক্তটা দিতে পারবো কি না।

রক্ত দেওয়ার সময় আধা ব্যাগ হওয়ার পর মনে হচ্ছিলো আমি শূন্যে ভাসছি, শরীর এতো হালকা লাগছিল। রক্ত দেওয়ার ৭ মিনিট পর দৌড়াইছি, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি তারপর সাইকেল চালায় ৩/৪ কি.মি আসছি। শরীর ১/২ ইঞ্চিও ঢুলে নাই।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

২০১১ সালের শেষের দিকে, তারিখটা সঠিক মনে নেই।

হঠাৎ কিছু জরুরী প্রয়োজনে কুমিল্লা যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পরে। তাই কক্সবাজার থেকে রাতের বেলা বাসে করে ফেনীর উদ্দেশ্যে রওনা করি। সকাল ৬.৪৫ মিনিটে ফেনীতে নেমে বন্ধু তারেকের বাসায় গেলাম।

কিছুক্ষন পরে তার মধ্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করলাম। ওকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, ৭ বছরের একটা থ্যালাসেমিয়া বাচ্চার জন্যে রক্তের প্রয়োজন। ব্লাড গ্রুপ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, আমার আর বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ মিলে গেছে।

ওকে বললাম আমি ব্লাড দিবো কিন্তু তারেক কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না, কারন এতদূর থেকে লং জার্নিতে আসার পর আবার রেস্ট না নিয়ে ব্লাড দেওয়াতে রাজি হচ্ছিলো না সে। তাই এক প্রকার জোর করে ব্লাড দেয়ার জন্য ওকে সাথে নিয়ে কুমিল্লা চলে গেলাম। ওখানে রক্তদানের কাজগুলো শেষ করে ঐদিন রাতেই আবার বাসে করে ফের কক্সবাজার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু।

খুব ভালো লাগছিলো প্রথম বার রক্ত দিতে পেরে, যদিও বা কিছুটা মাথা ঘুরাচ্ছিল।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। ভার্সিটির জীবন মাত্র শুরু করলাম। রক্তদান নিয়ে কোন অভিজ্ঞতা তখনো ছিল না। আব্বু একদিন বলেছিল আমার রক্তের গ্রুপ এ পজেটিভ। একদিন "বাধন" থেকে জানালো সাভার CRP তে রক্ত লাগবে এ পজেটিভ। রাজি হলাম। জীবনে প্রথমবার রক্ত দিতে গেলাম এ পজেটিভ ডোনার হিসেবে। তিনবার রক্ত পরীক্ষা শেষে হসপিটাল থেকে জানালো আমার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ! প্রথমবার রক্ত দিতে গিয়ে দিতে না পেরেই চলে আসলাম।

২ দিন পর। মাঝ বয়সি এক ভদ্রলোকের রক্ত লাগবে শ্যামলী ট্রমা সেন্টারে। রুমমেট কে নিয়ে রওনা হলাম। এবার কিন্তু ও নেগেটিভ ডোনার হিসেবে। একটু ভয় ভয় করছিলো একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। কিন্তু যখন রোগীকে দেখলাম কেমন জানি একটা অনুভুতি হল। উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কথা তখনো বলতে পারেন না তিনি। কিন্তু তার চাহনিতে কি জানি একটা ছিল। আমার সমস্ত ভয় যেন একটা ভালো লাগায় পরিনত হল। পাশের একটা ব্লাড ব্যাংকে গেলাম রক্ত সঞ্চালনের জন্য। যেই ছেলেটা ছোট বেলা থেকে সবসময় চুপচাপ থাকতো, দুষ্টমি করতো না হাত পা কেটে গেলে রক্ত বের হবার ভয়ে। সেই ছেলেটাই ব্লাড ব্যাংকের সাদা বিছানায় শুয়ে পড়লো ঐ মোটা সুঁইয়ের ভালোবাসা নেয়ার জন্য। যেই ভালোবাসায় ছিল অনেক গুলা মানুষের স্বস্তি। ছিল একটা পরিবারের ভবিষ্যৎ আর নির্ভেজাল প্রার্থনা।

এরপর আরো আঠারো বার রক্ত দিয়েছি। অনেক ভালো-খারাপ স্মৃতি আছে রক্তদানের। গতবছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি উনি ফোন করেছিলেন। ভালো মন্দ খোঁজ নেয়ার পর বললেন "আজকের দিনে ভাষা শহীদরা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিল তাই আমরা তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তুমি আমার জন্য রক্ত দিয়েছ। তোমার অবদানও আমার জীবনে অনেক মর্যাদাপূর্ণ"।

প্রথম রক্তদানের প্রাপ্তি ছিল এটা। প্রাপ্তি আরো একটা ছিল। তবে সেটা আমার নিজের। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নিজের শরীর যতদিন চলবে রক্তদান বন্ধ হবে না। ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল রক্তদাতারা। রক্ত দিন, জীবন বাঁচান।

প্রথম রক্ত দিয়েছিলাম এক বড় আপুকে। উনার প্রথম সন্তান হবার সময়। দুইদিন আগে আপু ফোনে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি ব্লাড দিতে পারবো কিনা। আমি বললাম পারবো (আপু তখনো জানতেন না যে আমি তখন চট্টগ্রামে)।

রাতের ট্রেনে উঠে সকালে ঢাকায় নেমে ব্লাড দিয়েই বিকেলে ট্রেনে আবার চট্টগ্রামে দৌড় কারন পরেরদিন ক্লাস ছিল। যদিও আপু পরে জানতে পেরে অনেক বকেছিলেন।

আপুর সেই বাবুটা কয়েকদিন আগে তিন বছরে পা দিয়েছে।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

ছোটবেলায় স্কুলে একবার ঢাকার একটি সংগঠন ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন করেছিল। আমরা দুই ভাই একই স্কুলে পড়তাম। সবার মতো আমিও রক্তের গ্রুপ চেক করি। রক্ত নেবার জন্য আঙ্গুল মুছে সুঁচের খোঁচায় রক্ত বের করে তিন ফোঁটা রক্ত কাঁচের টুকরার উপর রাখা হল। ছোট ভাই (নাজিম) আমার এ রক্ত নেওয়ার দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সেদিন অগোচরে ডেকে নিয়ে কিছুটা ক্ষোভের স্বরেই বলেছিল- "এতই দরকার রক্ত পরীক্ষার?"। পরবর্তীতে সেই ছোট্ট ভাইটিই আমার আগে রক্তদান করল! সেদিন তার রক্তের ব্যাগ হাতে নিয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম! যে কিনা একদিন আমার এক ফোঁটা রক্ত বের হওয়া সহ্য করতে পারেনি আজ সে অন্যের জন্য এক ব্যাগ রক্ত ঢেলে দিলো! গর্বে বুকটা ভরে উঠল আমার!

ফেসবুকে জীবনের প্রয়োজনে রক্তের পোষ্টগুলো দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অনলাইন ও অফলাইনে সাধ্যমতো এ সংক্রান্ত সহায়তার চেষ্টা চলে! এভাবে দীর্ঘদিন পর আমার রক্তদানের সুযোগ এলো! শারীরিক ও পারিপার্শিক অবস্থা প্রতিকূলে থাকায় নিজে দেওয়া হয়ে ওঠেনি আগে। সেদিন বিকেলে ফেইসবুকে এক পোস্টে জানতে পারলাম, ঢাকা শিশু হাসপাতালে মাত্র চার বছরের শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য চার ব্যাগ AB+ রক্তের প্রয়োজন। নাম্বার নিয়ে ফোন দিলাম, ততক্ষণে দুই ব্যাগ রক্ত পাওয়া গিয়েছে। মহাখালী থেকে ছুটলাম লেগুনায় শিশু হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। এখানে আসা আমার নতুন নয়, এ হাসপাতালে ভাল্বের নেফ্রটিক সিন্ড্রমের ট্রিটমেন্টের জন্য চারবছর ধরে যাতায়াত। এমন সংকটাপন্ন মুহূর্তে একটি শিশুর অভিভাবক কতটা অসহায়ত্বে ভুগেন তা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। দেখা হল শিশুর অভিভাবকের সাথে। পরিচিত হলাম ঢাকা কলেজের আরেক ডোনার ভাইয়ের সাথে। প্যাথলজি রুমে ডোনেটিং চলছে বিধায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ভাবলাম, পিচ্চিটাকে তাহলে দেখে আসি! বয়স চার, বাচ্চা মেয়ে। বারবার মায়ের আঁচলে মুখ লুকাচ্ছে, শত চেষ্টাতেও একটি ছবি তুলতে পারিনি। মায়ের ভারাক্রান্ত চোখেও কিছুটা হাসি, "আমার মাইয়াটা বড় লাজুক।"

ক্রসম্যাচিং শেষে রক্ত নেওয়া হলো! প্রথমে কিছুটা ভীতি কাজ করলেও পরক্ষণেই তা আর নেই! ব্যাগভর্তি আমার রক্ত, একটা শিশুর প্রাণ বাঁচাতে কাজে লাগবে ভেবে গর্ববোধ হচ্ছে আমার। পাঁচমিনিট পর বেড ছেড়ে বাইরে এলাম। পিচ্চিটার বাবার চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। "আরে ভাই, কি যে বলেন। এতো আমার দায়িত্ব। জানাবেন কেমন অবস্থা হয়। আমিও একসময় এসে দেখে যাবো" - বলেই বিদায় নিলাম।

পরদিন দুপুরে ফোন এলো- "ভাইয়া, আমার পিচ্চিটার জ্ঞান ফিরেনি ভাই! আমার মা আর কাউকে দেখে মায়ের আঁচলে মুখ লুকোবে না!ও আমাদের ছেড়ে চলেই গেল!"
আমি কোনো সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করতে পারিনি সেদিন। বলার সাহস করতে পারিনি যে, সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই কিংবা বলতে পারিনি সবাইকেই যেতে হয়। কেউ আগে, কেউ পরে! শুধু চোখ দুটো ভিজে উঠলো এই ভেবে যে, আমার রক্ত বুকে নিয়ে শিশুটা দুনিয়া ছেড়ে গেল!!

পুনশ্চঃ মানবিক বোধ হোক মানুষের পরিচয়! একটি জীবন বাঁচানোর উপলক্ষ হওয়ার চেয়ে স্বর্গীয় অনুভূতি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই! আসুন রক্ত দিই, জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করি।

অপরিচিত একজন মানুষ রক্ত খুঁজছে। আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।
নিজ ইচ্ছাতে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই কার জন্য কি গ্রুপের রক্ত লাগবে?
উত্তর দিল, ভাই এ পজেটিভ রক্ত তিন ব্যাগ লাগবে।
আমি বললাম, এক ব্যাগ আমি দিতে পারবো।

লোকটা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগ আপ্লুত হয়ে কেঁদে দিলেন প্রায়। ওই সময়টা আমার সেরা সুখের মনে হয়। রক্তদানের পর এমন ফ্রেশ ভাব কখনো মনে হয়নি।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

অনেক ভয় পেয়েছিলাম। অত বড় একটা সুঁই ঢুকাবে, দেখেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ক্রস ম্যাচিং করতে হাফ সিরিঞ্জ রক্ত নেওয়ার সময় ভেইন খুঁজে পায় না। খালি গুতায় আর গুতায়। ভাবলাম এই যদি হয় টেস্ট করার অবস্থা, আসল সুঁই ঢুকাইলে কই যামু!

ভাবলাম যা হওয়ার হইছে। এখনো হাতে টাইম আছে। জান নিয়া পালাই। বেড থেকে নামতেসি, এমন টাইমে সুন্দুরী ইন্টার্ন ডাক্তার আসছে ব্লাড নিতে! এখন ক্যামনে পালাই! দোয়া ইউনুস পড়তে পড়তে মনে মনে নিজের পিছে নিজে লাইথাইলাম। কি দরকার ছিল জান হাতে নিয়া রক্ত দেওয়ার? আর যাই করি, মাইয়া মাইনসের সামনে থিকা তো আর পালানো যায় না। আমার জানা যতো দোয়া আছে সব পড়া শুরু করলাম। চোখ-মুখ শক্ত কইরা আছি, কখন সুঁই ফুটায় আল্লাহ!

দুই মিনিট যায় তিন মিনিট যায়, কি ব্যাপার! কিছুই দেখি টের পাই না! ডাক্তার মাইয়াডা কি আমার লগে মজা লয়? চোখ খুইলা দেখি, ওমা! রক্ত অর্ধেক ব্যাগ ভইরা গেসে! কখন সুঁই ঢুকাইছে টেরই পাই নাই!

এরপরে শুরু করলাম মিশন। আমার যত ক্লাসমেটের ব্লাড গ্রুপ জানা আছে, সব কয়টারে ব্লাড দেওয়াইছি। ঘেটি ধইরা নিয়ে গেছি ব্লাড দিতে। প্রথমে সব কয়টাই মনে মনে আমার গুষ্ঠি উদ্ধার করছে, কিন্তু এখন বুঝে আসল মজা। মানুষের জীবন বাঁচানোর মজা। নিজের অস্তিত্ব সারা দুনিয়ায় ছড়ায় দেওয়ার মজা।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Arman Khann অভিজ্ঞতাঃ ১৯ (সূচিপত্র)

আমি প্রথম রক্ত দেই এস.এস.সি দিয়েই। ফেইসবুকে রক্তের রিকুয়েস্ট দেখে রোগীর আত্মীয়ের নাম্বার নিয়েই আমি কল করি এবং কনফার্ম করি।

আমার রক্তের গ্রুপ এ নেগেটিভ কিনা কনফার্ম ছিলাম না। অনেক আগে পরিক্ষা করিয়েছিলাম। যাইহোক, ভয়ে ভয়ে রক্ত দিতে কল্যানপুর থেকে (কল্যানপুরে আড্ডা দিচ্ছিলাম)। পকেটে টাকা ছিল না। এক বন্ধুর থেকে ২০ টাকা ধার নিয়ে যাই। ১০ টাকা বাস ভাড়া। আগেই জানতাম রোগী দেখে তারপরে রক্ত দিতে হবে। তাই রোগীকে দেখলাম। বৃদ্ধের শরীর একেবারে কংকালের থেকেও চিকন। পিত্তথলি অপারেশান হয়েছে, আবার ২ টা ফুটো হয়ে গেছে। তাই ৩ দিনের ভিতরেই দ্বিতীয় অপারেশান করতে হবে। যাইহোক, অনেক খাওয়ালো আমাকে। কিন্তু আমি ভয়ে ঘেমে অস্থির। না না! রক্ত দেওয়ার ভয়ে না, যদি আমার রক্ত এ নেগেটিভ না হয়, তাহলে তো খুব লজ্জায় পরবো তাই। পরে টেস্ট করে রক্তের গ্রুপ মিলে গেল রোগীর সাথে। রক্তদান করলাম। খুব ভালো লাগলো।

পরে উনি আমাকে কতগুলো এক হাজার টাকার নোট হাতে নিতে বলল। আমি কিছুতেই নিলাম না। ততোই উনি জোর করতে লাগলেন। এক পর্যায় বাধ্য হয়ে আমি বললাম, আমি কি রক্ত বিক্রি করতে আসছি নাকি? লজ্জা পেয়ে তিনি ১০ টাকার ১ বান্ডিল নিতে অনুরোধ করলেন, যাতায়েত ভাড়া হিসেবে নিতে বললেন। কিন্তু তখনও আমি অপারগ, যদিও আমার পকেটে ১ টাকাও নেই যে বাসায় ফেরার জন্য। পরে অনেক জোরাজুরিতে আমি শুধু ১০ টাকা চেয়ে নিলাম। অনেক দুঃখিত আমি সবার কাছে ১০ টাকা নেওয়ার জন্যে।

এরপর আমি অনেকবার রক্ত দান করলাম কিন্তু কোন প্রকার টাকা ছাড়াই। ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে আমি ১০০ করতে চাই। সকলের দোয়া চাই আল্লাহ যেনো ১০০ বার রক্ত দানের আগে মৃত্যু না দেন।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

মোহাম্মাদপুর জাকির হোসেন রোডে লালমাটিয়া মাদ্রাসায় পড়ি। মাদ্রাসার পাশেই অনেক গুলো প্রাইভেট হাসপাতাল। তো, প্রায় একদুইজন রোগীর আত্মীয় আসে রক্ত সংগ্রহের জন্য। বেশিরভাগ সময়ই ডোনার পেয়ে যায়। কারন এত বড় একটা মাদ্রাসা, কতগুলো ক্লাস, প্রত্যেক ক্লাসেই চার পাঁচজন ডোনার থাকতো রিজার্ভ।

আমাদের ক্লাসে আশিক নামে আমার এক বন্ধু ছিল সে খুবই আন্তরিক এবং সহানুভূতিশীল। নিয়মিত নিজে রক্তদান করত এবং রক্তদানে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করত। আশিক ভাই রক্ত ম্যানেজের কাজে এত বেশি সময় দিত যে, ক্লাসের সবাই আমরা তাকে মজা করে রক্ত-মানব বলে ডাকতাম। বুঝতে পারতাম রক্তদান করার আগে অনুভুতি থাকে একরকম আর রক্তদান করার পর অনুভুতি হয় অন্যরকম। নিজ দেহের এক ব্যাগ তাজা রক্ত অন্যকে দান করা এবং তার মূখে হাসি ফোটানো এর চেয়ে বড় ইবাদত আর কি হতে পারে!!

আশিক ভাই আর আমি পাশাপাশি বেডে থাকি। আশিক ভাইকে দেখে আমারও ইচ্ছা হতো নিয়মিত রক্তদান করে মানুষের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখার। সেদিন ছিল শুক্রবার, সময় সকাল ৮ টা। হঠাৎ এক লোক আসে বি+ রক্ত সংগ্রহের জন্য। এক মায়ের ব্লাড ক্যান্সার। প্রতি তিন মাস পরপর তিন ব্যাগ রক্ত লাগে। আশিক ভাই কাউকে না পেয়ে লোকটাকে আমার নাম্বার দিয়ে দেয়। আমি আগে কখনো রক্তদান করিনি, তাই ভয়ে বুক দুরুদুরু করছিল। অজানা ভয়, চিন্তা মনোবল ভেঙে দিচ্ছিল বারংবার। আশিক ভাই আমাকে সাহস দিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন। অবশেষে এক বুক সাহস নিয়ে গেলাম রক্ত দিতে গেলাম। এক সিরিঞ্জ রক্ত নেয়ার পর কেমন যেন অনুভব করছিলাম। ডাক্তার ব্লাড টেষ্ট করে বললেন সব ঠিক আছে আজ এক ব্যাগ চলছে আপতত লাগবে না। কাল সময় মত আসবেন। মনে মনে ভাবলাম যাক বাঁচা গেল কিন্তু নাহ পরের দিন ঠিক সেই সময় ফোন আসে। ২৫ সে মার্চ ২০১৪ ইং তারিখে আলহামদুলিল্লাহ্ খুব নির্ভয়ে রক্তদান করলাম।

সবচেয়ে বড় কথা যাকে রক্ত দিয়েছিলাম সেই মা আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে ছিল! সেই চোখের চাহনি আমি আজও বুলতে পারিনা। আর হ্যাঁ, রক্তদানের আগে যে আশংকা কাজ করেছিল তার কিছুই আর মনে নেই। এমন কি মোটা সুঁইয়ের আঘাতটাও বুঝতে পারিনি ঠিক মত। আশিক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ সে আমাকে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। আমি এখন নিয়মিত রক্তদান করি এবং যতটুকু পারি রক্ত যোগাড় করে দেবার চেষ্টা করি।

রক্তদানের পর পর জানতে পারলাম রোগীর আত্মীয়দের অনেকেরই বি+ রক্ত ছিল, কিন্তু তারা দেয়নি। কারন বাইরে থেকে কেউ দিলে নিজেদের মূল্যবান রক্ত তো আর দিতে হবে না!
ব্যাপারটা জানার পর সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিল আমার।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Sabbir Ahmed অভিজ্ঞতাঃ ২২ (সূচিপত্র)

দারুন অভিজ্ঞতা।

হুট করেই অফার আসে, দুই ব্যাগ রক্ত লাগবে। একবার ভাবি দিবো, আর একবার ভয়ে না বলি। পরে অবশ্য রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু ডাক পড়লো রাত ১টায়। এত রাতে হাসপাতাল যাওয়া তো অনেক রিস্কি কারন সময়টা ছিলো কেয়ারটেকার গভঃ এর। তবুও বের হলাম। রিক্সা নিয়ে কিছুদূর যেতেই পুলিশ থামিয়ে দিল। রক্ত দিতে যাবো বললে শুনেনা। অগত্যা অনেক বলে-কয়ে পুলিশের গাড়িতেই গেলাম। উনারা অবশ্য পরে বুঝতে পেরে আমাকে বাহবা দিয়েছিলেন।

সূচ যখন সামনে নিয়ে আসে, তখন ভীষন ভয়ে ভয়ে ছিলাম, পুশ করার সময় ভয়ে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। তখনও জানতাম না এই রক্ত নিয়েই উচ্চতর পড়াশুনা করবো। এখন তো রক্ত দেয়ার পাশাপাশি নিজেও অনেকের রক্ত নিই। ভালো লাগে এই মহান কাজে জড়িত থাকতে পেরে।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ আফসানা আজমী অভিজ্ঞতাঃ ২৩ (সূচিপত্র)

প্রথম রক্তদানের সময় - ২০১১ সালের মার্চ মাসে। রক্ত দিয়েছিলাম আমাদের ভাড়াটিয়ার ১২/১৩ বছর বয়সী বাচ্চাকে। যখন আম্মু ফোন দিয়ে জানালো যে আর্জেন্ট বি পজিটিভ ব্লাড লাগবে তখন আমি টিউশনে ছিলাম। বাচ্চার এরপরের দিনই টিউটোরিয়াল পরীক্ষা ছিল মনে আছে। আমার চলে আসার সময় স্টুডেন্টের আম্মুর সাথে আমার বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। শেষে ওনাকে আশ্বস্ত করলাম, যত দেরি হোক আমি এসে আবার পড়াবো। মজার ব্যাপার হচ্ছে তখন আমার এটা মোটেও খেয়াল ছিল না যে আমি এই প্রথম কাউকে রক্তদান করতে যাচ্ছি। মনে শুধু এটাই ছিল কখন আমি হাসপাতালে পৌঁছাবো।

আমি সুঁই ভয় পাই না যার কারনে রক্ত দেওয়ার সময় কোন ভয় কাজ করে নাই আমার। তবে না খেয়ে রক্ত দেওয়াতে আর সাথে সাথে উঠে যাওয়াতে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত ছিল যখন বাচ্চার নানু আমাকে জড়ায় ধরে কান্না করছিল।

সামান্য ব্যাথা উপেক্ষা করে একটা মানুষের জীবন বাঁচিয়ে তার কাছের প্রিয় মানুষগুলার হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা দূর করে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি যদি নিজের মনে ছড়িয়ে দেওয়া যায় - তাহলে রক্তদান করতে কেন আপনি পিছপা হবেন? আপনার রক্তে বাঁচবে একজন মানুষ এরকম ভাবতেই একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করে এই অনুভূতির কাছে ঐ সামান্য সুঁইয়ের ব্যাথা সহ্য করা সেই তুলনায় কিছুই না।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Pavel Babu অভিজ্ঞতাঃ ২৪ (সূচিপত্র)

জীবনে প্রথমবার রক্ত দিতে গিয়ে তেমন বড় কোনও ঘটনা আমার সাথে ঘটেনি! তবে হ্যাঁ, প্রথমবার রক্ত দেয়ার সময় ছোট কয়েকটা ঘটনা আছে। আমি তখন সবে এসএসসি পাশ করে এইচএসসি'র জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এর কিছুদিন পরেই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর বোনের ব্লাড ক্যানসার ধরা পড়ে। আমি খুব উৎসুক হয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, দোস্ত, তোর বোনের রক্তের গ্রুপ কি? বন্ধু জানালো বি নেগেটিভ! আমার বন্ধুর বোনের ব্লাড ক্যানসারের খবরে আমার দুঃখী হবার কথা! কিন্তু আমি তখন মনে মনে বেশ আনন্দিত ছিলাম এই ভেবে যে, জীবনে প্রথমবার রক্ত দিবো! তাও বেষ্ট ফ্রেন্ডের বোনকে!

আমি বন্ধুকে বললাম, দোস্ত, আমারও বি নেগেটিভ! রক্ত লাগলে আমারে বলিস, আমি দিবো!
আমার কথা শুনে বন্ধু যেনো সাত রাজার ধন পেয়ে গেলো! সে সাথে সাথে আমাকে বলে বসলো, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে আয় তুই! আমি গত রাত থেকে রক্ত খুঁজতেছি! কাউকে পাচ্ছি না!

তখন রাত আনুমানিক আটটা বাজে! আমি ধানমণ্ডি থেকে সেন্ট্রাল হাসপাতালে গেলাম! ব্লাড দেয়ার জন্য ব্লাড ব্যাংকের সামনে গেলাম দুজন! ট্রাস্ট মি, প্রথমবার রক্ত দিবো, অথচ আমার মধ্যে কোনো ভয় কাজ করছিলো না! আমি ব্লাড দেয়ার জন্য ডাক্তারের সম্মুখীন হলাম! ডাক্তার আমাকে কিছু বেসিক প্রশ্ন করলো যার কিছুইটার উত্তরই আমি সঠিক দিতে পারি নাই। এর চেয়ে বড় চমকের বাকী ছিলো বন্ধুর বোনের রক্তের গ্রুপে! ডাক্তার যখন দেখলো আমার বি নেগেটিভ, তখন উনি বললেন, রোগীর রক্তের গ্রুপ তো ও নেগেটিভ! আপনার দ্বারা তো হচ্ছে না! মনটাই খারাপ হয়ে গেলো! বন্ধুকে বললাম, কীরে? তোর বোনের না বি নেগেটিভ? বন্ধু জানালো সে ভাবছে বি নেগেটিভ। কীভাবে এমন ভুল ভাবছে আমি জানি না! শেষে আমি ব্লাড না দিতে পেরে বাসায় যাই!

আমি এখন এইচএসসি'র ছাত্র! অরিয়েন্টেশন ক্লাসে বসে বসে ঝিমাচ্ছি! নতুন কলেজ! কাউকেই চিনি না! আমাদের প্রিন্সিপ্যাল মাহফুজুল স্যার হঠাৎ বলে উঠলেন, কলেজে একটা ব্লাড ক্যাম্পেইন হবে! যারা নিজের ব্লাড গ্রুপ জানে না তাঁরা জেনে নিবে! আর যারা জানে তাঁরা স্বেচ্ছায় এক ব্যাগ রক্ত দিবে! সেই রক্ত যাদের দরকার, তাঁদের দেয়া হবে! এবার আমি আগের চেয়ে আরো বেশি আনন্দিত এই ভেবে যে, রক্ত এবার দিতেই পারবো! ও নেগেটিভ আর বি নেগেটিভ এর কোনো ক্যাচাল নেই! পরের চারদিন পর আমাদের কলেজে ব্লাড ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা করা হয়! সাদা সার্ট আর কালো রঙ এর প্যান্ট পরে রক্ত দেয়ার জন্য ক্যাম্পে যাই! যাবার পর কর্তব্য রত ডাক্তার আমার ওজন মাপার জন্য মেশিনে দাঁড়াতে বলে! এর আগে পেপারে আমি লিখে রেখেছিলাম আর রক্তের গ্রুপ বিনেগেটিভ! আমি ওজন মাপতে দাঁড়ালাম! দাঁড়াবার পর ডাক্তার বলছে, "আপনি রক্ত দান করতে পারবেন না! কারণ আপনার ওজন মাত্র ৪৫।" আমি কোনো ভাবেই ডাক্তারকে বোঝাতে পারি নাই যে আমি রক্ত দিবোই! ডাক্তার বললো, তোমার ওজন অনেক কম! নিম্নে ৫৫ ওজন হতেই হয়! এছাড়া রক্ত দেয়া যায় না! বেশ কিছুক্ষণ পর যখন ছাত্র-ছাত্রীদের জটলা পাঁকে, আমি তখন অন্য কর্ণার দিয়ে আরেক ডাক্তারের সামনে যাই! এবারও সেম জিজ্ঞাসা! ওজন মাপেন! আমি আগে থেকেই ট্রিক্স করে রেখেছিলাম! যদি যেতে পারি তাহলে বলবো, "ঐ কর্ণারে [আমি প্রথম যেখানে ফেইলর হই] অনেক ভিড় লেগে আছে বলে এখানে এসেছি। ওজন মেপেছি আমি! আমার ওজন ৫৮! ব্যস, ডাক্তার মশাই আমার মতো ফাজিল ছেলের কথা বিশ্বাস করে বললো, জুতো খুলে বেড়ে শুয়ে পড়েন!

এবার আমি কিছু ভয়ে আছি! আল্লাহ্, এক ব্যাগ রক্ত নিলে আমি বাঁচবো তো? কতো ব্যথা যেনো পাই! পরে দেখলাম ডাক্তার একটা ব্যাগ নিয়ে আমার সামনে হাজির! ব্যাগ দেখে যতোটানা ভয়ে ছিলাম তাঁর চেয়ে বেশি ভয়ে ছিলাম সুঁই দেখে! মনে মনে আল্লাহ্কে ডাকছিলাম আর বলছিলাম, ব্যথা যদি পাই আর বেঁচে যদি থাকি, জীবনে আর রক্ত দিবো না!
না... আমি ব্যথা পাইনি! ব্যথা পাবার কোনও প্রশ্নই আসে না! যারা একবার ব্লাড দিয়েছে ক্যাবল তাঁরাই জানে রক্ত দিতে ব্যথা লাগে না। লাগে শুধু সামান্য পরিমাণ ইচ্ছে! আমি জানি না অল্প বয়স আর অল্প ওজন নিয়ে রক্ত দিতে চেয়েছিলাম কেন? শুধু এটা জানি যে আমার এক মামা আমাকে বলেছিলো, "রক্ত বানানো যায় না! এই একটা জিনিসই মানুষ মানুষকে চাইলেই দিতে পারে!" হয়তো কথাটা আমার মনে খুব ভালো করে দাগ কেটেছিলো! তা না হলে আমি আজ ১৮ তম বারের মতো রক্ত কোনও দিনও দিতে পারতাম না!

আর একটা কথা, প্রতিবার রক্ত দেয়ার সময়েই আমার মনে হয়, এটাই বোধ হয় আমার প্রথম রক্তদান!" এই ইচ্ছাটা ধরে রাখতে চাই! কারণ, ছোট্ট এই জীবনে শততম বছরের বাঁচার সুযোগ না পেলেও, শততম বার রক্ত সুযোগ করে নিতে চাই।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ A.r. Mahmud Mueid অভিজ্ঞতাঃ ২৫ (সূচিপত্র)

তখন আমি নিউ টেনে পড়ি, আর দিনটা ছিল ২৭শে রমজান।

এক সকালে স্যারের বাসায় পড়তে যাবার সময় আমার এক বন্ধু আমায় অনেক মিনতি করে বলছিল যে ওর এক অ্যান্টিকে রক্ত দেয়ার জন্য। ওর জানার মধ্যে আমিই একমাত্র যার রক্তের গ্রুপ বি পজেটিভ (অ্যান্টির কিসের যেন অপারেশন হবে তাই সেদিনই রক্ত লাগবে)। তো আমি তাকে সাথে সাথে কিছুই বলতে পারলাম না কারন তখনও আমার বয়স হয় নাই আর আমি সেদিন রোযা ছিলাম। আমি আমার বন্ধুর কাছে থেকে একটু ভাবার সময় নিয়ে পড়তে চলে গেলাম।

২ ঘন্টা পড়ার পরে বের হয়ে দেখি আমার বন্ধুটা স্যারের বাসার সামনে দাড়িয়ে আছে। ওকে ওভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে আমি আর ওকে না বলার শক্তি পেলাম না (অবশ্য না বলার শক্তিটা আমার এমনিতেও কম)। তো আমি ওর সাথে ওর অ্যান্টিকে দেখতে হাসপাতালে গেলাম। আর সেখানে ডাক্তারের সাথে কথা বললাম। ডাক্তার আমার উচ্চতা আর ওজন মেপে দেখলেন। আর রক্ত দেওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি তখন ডাক্তারকে আমার বয়সের বিষয়ে জানালে ডাক্তার জানালেন "উচ্চতা অনুযায়ী ওজন বেশি থাকায় বয়সটা আর প্রাধান্য দিচ্ছি না। তাছাড়া রোগীর অবস্থাও ভাল না তাই"।

তো ডাক্তারের অনুমতি পাওয়াতে একটু সাহস পেলেও আব্বু-আম্মুকে জানানোর সাহস হয়নি। ভয় নিয়েই রক্ত দিতে গিয়েছিলাম। আমার এখন মনে আছে সেদিন রক্ত দিয়ে প্রায় সাথে সাথেই আমি বেড থেকে উঠে গিয়েছিলাম আর তারপর কোন রকমে ২ গ্লাস স্যালাইন খেয়েই বন্ধুর সাইকেলের পিছে চড়ে বসেছিলাম।

সেদিন বাসায় এসে কেউকে কিছুই বলতে পারি নাই। যেহেতু রোযা, তাই বাকি দিনটা না খেয়েই কাটাতে হয়েছিল। যদিও দুপুরে বাসায় সবার অগোচরে একটা অ্যাপেল চুরি করে খেয়েছিলাম তবে আমার খাওয়ার পরিমান হিসেবে তা অতিনগণ্য ছিল ।

তারপর সারা দিন পরে সন্ধ্যায় সবার সাথে ইফতারি করেছিলাম।

আর আমার রক্ত দেওয়ার বিষয়টা একমাত্র আমার প্রিয় লাল ডায়রিটা ছাড়া আর কেউকেই জানতে দেই নাই (অবশ্য প্রায় ৫/৬ মাস আমার আপু ডায়রিটা পরে সে সম্পর্কে জানতে পারে আর সবাইকে জানায়। কিন্তু তাতে তখন আর তেমন সমস্যা হয় নাই)।

রক্তদাতাঃ Ahmed Twaha অভিজ্ঞতাঃ ২৬ (সূচিপত্র)

রক্তদানের অভিজ্ঞতার কথা আর কি বলব! কোন প্ল্যান ছিল না রক্ত দেয়ার।
যদিও ভাবতাম একদিন দিব। তো সেদিন ভাবলাম শুরুটা হোক বিজয় দিবসে। তারপর গিয়ে স্টেটমেন্ট এ সাইন করলাম। ভেবেছিলাম কষ্ট হবে, কিন্তু না শুধু সুই ফোটানোর ব্যাথাটা। আর খোলার সময় হালকা লেগেছিল।

তো রক্ত দেওয়া শেষ হওয়ার পর , কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব নিয়ে উঠলাম। চলে যাব কিন্তু ডাক্তার যেতে দিলনা। বললেন, পানি খাও। আমি ভদ্র ছেলের মত খেয়ে নিলাম। তারপর ইজি চেয়ারে রেস্ট নিতে বললেন। আমি ভাব নিয়ে বললাম , আরেহ না ঠিক আছি আমি। তবুও জোর করে পাঠালেন। রেস্ট নিচ্ছি , হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, বমি বমি লাগছে , শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হচ্ছে। আমি তখন ভাবছি , আমি শেষ। সিনেমায় দেখেছি মারা যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

আমি ভাবলাম আজরাইল (আঃ) এর সাথে প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে লাভ নেই। তাই আমিও চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম, অনেক্ষণ। কিন্তু মারা যাচ্ছিনা কেনো এটা দেখতে চোখ খুললাম। ওমা! চোখ খুলে দেখি সব দেখতে পাচ্ছি আবার। ভাবলাম আজরাইল (আঃ) হয়তোবা ভেবেছেন আমি মরে গেছি তাই কষ্ট করে আবার মারতে আসেননি।

কিন্তু এখন ভয় কেটে গেছে।
এর মধ্যে আরো ২ বার দেওয়া হয়ে গেছে, ১০০ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ্।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

প্রথম রক্ত দান করি ঈদের দিন। ঈদ নিয়া অনেক প্লান। কিন্তু নিশি আপু ফোন দিয়ে বলল ব্লাড দেয়া লাগবে। বললাম, আমার বয়স কম। ১৮ বছর ১৭ দিন মাত্র। উনি বললেন, সাবালক হয়েছিস। দিতে পারবি।

রামগতি থেকে নোয়াখালী চলে গেলাম। ব্লাড দিলাম। তবে ১ ব্যাগ না, ২ ব্যাগ! জানতাম না ১ ব্যাগ এর বেশি দিলে সমস্যা হয়। ১ ব্যাগ দিতে গিয়ে দেখি আরেকজন রোগীরও রক্ত দরকার। ওই রোগীকেও রক্ত দিয়ে দিলাম। এরপরে অসুস্থ হলাম। সাথে অর্ণব ভাই আর নিশি আপুর ফ্রি পেলাম।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

জীবনের প্রথম রক্তদান কিছুটা ভয় এবং উত্তেজনার! আমার ১ম রক্তদানের অভিজ্ঞতা আজও আমায় কাঁদায়, সত্যিই কাঁদায়।
আমি মেসে থাকি। আমার মেস মালিক নিয়মিত রক্তদান করেন। তারিখটা ২০১৪ সালের ১৬ই আগস্ট। কথা প্রসঙ্গে মেস মালিক তার রক্তদানের কিছু মজার ঘটনা আমাকে শোনালেন। ভালোই লাগল, বললাম "নজু ভাই, কারো O+ লাগলে আমাকে জানাবেন।"

পরদিন দুপর পৌনে তিনটার দিকে আমি মাত্র খেতে বসেছি এমন সময় নজু ভাইয়ের ফোন!!
- মেহরাব!! তুমি কই?
- ভাই, রুমে। খেতে বসছি। কোনো দরকার ভাই?
- আধা ঘন্টার মধ্যে গণস্বাস্থ্যর সামনে আসতে পারবা?রক্ত লাগবে।
- আসতিছি!!
- খাওয়া শেষ করে আসো।
- ঠিক আছে!

কিসের খাওয়া আর কিসের কি! কোনোরকম দুই লোকমা মুখে পুরেই দৌড়। একটা বাচ্চার রক্ত লাগবে, বয়স মাত্র ২০ দিন! বাচ্চাটার ২ দিন বয়সে জন্ডিস ধরা পরে। ধানমণ্ডি ছয় নাম্বার রোডের পেডিহোপ হসপিটাল ফর সিক চিলড্রেন। হাসপাতাল বরাবরই আমার কাছে ভয়ানক একটা জায়গা, তবুও সাহস করে ঢুকলাম। সাথে নজু ভাই। প্রথমেই বাচ্চার নানার সাথে কথা হল, বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়। যখন আমার রক্ত নিতে প্যাথলজিস্ট আসল স্কিনিং এবং ক্রসম্যাচিং করবে বলে আমি তো শেষ! সূচ! আল্লাহ! বাঁচাও! কোনো রকম চোখ বন্ধ করে অন্য দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে একটু রক্ত দিলাম। ১ ব্যাগের কথা ভাবতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল! কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাব?
আব্বুকে ফোন দিলাম। বললাম সবকিছু। সেদিন আমি জানলাম আমার আব্বুর লাইফের একটা সিক্রেট! আব্বু ১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ব্লাড ডোনেট করেছে! আমি তারই সন্তান! বুকের ভেতরটাতে একটা অদম্য বল চলে আসে মুহূর্তে। আমি ব্লাড দিবই whatever it takes!
দেড় ঘন্টা পর আমার রিপোর্ট আসল। রিপোর্ট ভাল। যাক বাবা! আমার কোনো অসুখ নেই! গেলাম ডোনেটিং রুমে। এবার আরও মোটা ও বড় সূচ! কলিজাটা শুকিয়ে শুঁটকি মাছ হয়ে গেল! হায়রে, এবার আমি নির্ঘাত মাথা ঘুরে পরে যাব।
বেডে শুলাম আর মনে মনে দোয়া-দরুদ পড়ছি। প্যাথলজিস্টটা আমার হাতে সূচটা ঢুকিয়েই দিল! কি আর করার! তখন আমি হাতের মধ্যে দেয়া বলটাকে ভর্তা করার বৃথা চেষ্টা করছি। ২ মিনিটও হয়নি, বলল কাজ শেষ! মাত্র ১০০ এম.এল. রক্ত নিল! যাক বাবা, বাঁচা গেল! আর রক্ত দিব না, কোনোদিন না। এত চাপ! আর সূচ! ৫ মিনিট পর মনে হল চোখে কিছু দেখি না, মাথাটাও ঘুরছে! আর যা পিপাসা! নজু ভাইকে বললাম পানি খাব। বেডে শুয়েই এক টানে ২ লিটারের বোতল খালি! তবুও মনে হয় আরও পানি খাই। প্রায় ৩০ মিনিট পর একটু স্বাভাবিক লাগল, উঠে বসলাম। দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলাম পা কাঁপছে! রুম থেকে বের হতে না হতেই কি যেন হল, বুঝলাম আমি কারো বাহুডোরে। তাকিয়ে দেখি তাসকিনের নানা (বাচ্চাটার নাম রাখা হয়েছিল

তাসকিন আহমেদ) আমায় জড়িয়ে কাঁদছে। তার মুখে যে কৃতজ্ঞতা ও প্রশান্তির ছাপ তা আমি খুব কমই দেখেছি। হঠাৎ আব্বুর কথা মনে হল। এই প্রশান্তি দেখেই হয়তো আব্বু এতোগুলো বছর রক্ত দিয়েছে! এবার মনে একটা স্বর্গীয় শান্তি অনুভব করতে শুরু করলাম।

"আচ্ছা, বাবুটাকে তো দেখা হল না" নজু ভাইকে বললাম। ভাই বলল- চল। ICU তে ছোট ছোট অনেক গুলা কাঁচের বক্স।সবগুলোতেই ছোট ছোট বাবু। তাসকিনের বক্সটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কেন যেন টুপ করে এককোঁটা জল আমার গাল বেয়ে পড়ে গেল। ২০ দিনের একটা বাচ্চার দু'হাতে দুটো কেনুলা লাগানো, স্যালাইন লাগানো আছে, আর রক্ত। আমার শরীরের রক্ত!

ICU থেকে বের হতেই তাসকিনের নানা এসে তাসকিনের আম্মুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। তার চোখের চাহনিটা শুধু একটা কথাই বলল "ভাই, আমার নাড়িছেঁড়া ধনকে তুই বাঁচালি!" আরো কিছুক্ষণ সেখানে থেকে বের হয়ে আসলাম। পা কাঁপছে ঠিকই কিন্তু মনটার অনুভূতি প্রকাশ করার মত না! রাতে তাসকিনের চাচ্চু ফোন করে আমার খোঁজখবর নিল। বলল, রক্ত দেয়ার পর নাকি সে হাত-পা নাড়াচাড়া করছে তাই ডাক্তার তাকে ICU থেকে রিলিজ করে জেনারেল ওয়ার্ডে শিফট করেছে। সে নিজেই স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিচ্ছে, অক্সিজেন মাস্কও খুলে দিয়েছে।

কে জানতো এটাই তার জীবন সায়াহ্ন। রাতে হঠাৎ আবার তাসকিনের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। আবার অক্সিজেন দেয়া হয়। কিন্তু আর কোনো কাজ হয় না। তাসকিন চলে যায় না ফেরার দেশে! সকালে খবরটা জানতে পারি নজু ভাইয়ের কাছে, পরে তাসকিনের চাচ্চু ফোন দিয়ে জানায়।

... Blood for Humanity, Blood for Bangladesh

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Khair Amin অভিজ্ঞতাঃ ২৯ (সূচিপত্র)

২০১২ সালের এপ্রিলের কোন এক সকালে বন্ধু এবায়েদ ফোন করে বলল যে পরিচিত একজনের কিডনী অপারেশন এর জন্য দুইব্যাগ ও পজেটিভ রক্ত লাগবে। আমার দেয়ার ইচ্ছে ছিল অনেক কিন্তু, একটু অসুস্থ থাকাতে রিস্ক না নিয়ে একটা বন্ধু ও আরেকটা ছোট ভাইকে নিয়ে গেলাম কুমিল্লা মুক্তি হাসপাতালে। বন্ধুর রক্ত টানানোর পর ছোট ভাইয়ের ওজন না হওয়াতে দিতে পারেনি। এদিকে রোগীর অবস্থা আর ওই সময় ওনাদের রক্ত না পাওয়ার অসহায়ত্ব দেখে মানবিকতার কাছে অসুস্থতা হার মানল। যেহেতু তখন সামনেই আরেকজন বন্ধু রক্ত দিয়েছে তাই ভয়টা একটু কমই ছিল।

যাক রক্তদান শেষ করে রোগীর লোকদের কৃতজ্ঞতা আর রোগীর ছলছল চোখের চাহনি ও আমাদের মাথায় আবেগী হাত বুলিয়ে দোয়া করাতে অনুভব করছিলাম যে রক্তদানের আসল প্রশান্তিটা হয়ত এখানেই - নিজের রক্তে অন্য আরেকটা মানুষের বেঁচে ওঠা, বেঁচে থাকাটা দেখাতেই! এরপর থেকে প্রতি তিনমাস পরপরই এই প্রশান্তিটা নিয়ে আসছি এবং সামনের দিনগুলোতেও নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

চলুন না ! এই প্রশান্তিটা আমরা সবাই মিলে নেই। আসুন না, শপথ করি, আর একটা মানুষকেও রক্তের অভাবে হাসপাতালের বিছানায় কাতরাতে দেব না!

#HappyBloodDonating.

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব সুজন অভিজ্ঞতাঃ ৩০ (সূচিপত্র)

আমার প্রথম রক্তদান ছিলো ২০০৮ সালে। আমি ৪০ দিনের জন্য ময়মনসিংহ জামাতে গিয়েছিলাম। ৪০ দিন শেষে ঢাকা থেকে নোয়াখালীর উদ্দেশ্য বাসে উঠলাম মার্চ এর ১ তারিখে। বাড়িতে আসার সময় বাসে রুনা নামের এক বোনের সাথে পরিচয় হয়। জিজ্ঞেস করলাম,

– কোথায় যাচ্ছেন?

– নোয়াখালীতে যাচ্ছি

- কেন?

- আমার এক বান্ধবীর ডেলিভারি হবে। তাকে ব্লাড দিতে যাচ্ছি।

- আপনার ব্লাড গ্রুপ কি?

- এবি পজিটিভ। রক্ত লাগবে ৩ ব্যাগ। আমি এক ব্যাগ দিলে আরো দুই ব্যাগ লাগবে। কি করবো বুঝতে পারছি না।

আমি তখনো আমার ব্লাড গ্রুপ কি জানি না। এর মধ্যে আমি রুনার নাম্বারটা নিলাম। রুনাকে আমার নাম্বার দিলাম। আমি সেনবাগ রাস্তার মাথায় গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি চলে গেলাম সেনবাগ মদিনা প্রাইভেট হাসপাতালে। ২ মার্চ রাত তখন প্রায় ১টা হবে সম্ভবত। হাসপাতালে গিয়ে বললাম, আমার ব্লাড গ্রুপ কি জানতে হবে। ডাক্তার এসে তিন ফোটা ব্লাড নিলেন। পাচঁ মিনিট পর এসে বললেন, তোমার ব্লাড গ্রুপ এবি পজিটিভ। আমি তখন এত খুশি হলাম যে সাথে সাথে রুনাকে ফোন দিয়ে বললাম, রুনা, আমার ব্লাড গ্রুপ এবি পজিটিভ।

এরপর আমার এক বন্ধুর বাইক নিয়ে রওয়ানা হলাম চৌমুহনী লাইফ কেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। হাসপাতালে গিয়ে জীবনে প্রথম বারের মত ব্লাড দান করলাম। এর কিছুক্ষণ পরে আপুর একটি ফুটফুটে ছেলে হল। আমি তখন আরো খুশি হলাম কারন আজকে আমার ১৭ তম জন্মদিন ছিলো। আর এটাই ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন।

যাকে আমি কখনো ভুলতে পারবো না, সে হলো রুনা, যার কারনে আমি এতো বড় মহৎ কাজ করতে পেরেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ রুনা বোন তোকে। তখন থেকে আজকে দিন পর্যন্ত ব্লাড দান করছি, গত ১৮/০১/১৬ তে ১৭ তম বার ব্লাড দান করেছি। ইনশাআল্লাহ ১০০ বার দান করার ইচ্ছে আছে।

রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচান

মানুষ কেন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে এরকম একটা প্রশ্ন সর্বদাই ছিল মনের মধ্যে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই আজ আমি রক্তযোদ্ধা। তখন সবেমাত্র আমি নতুন স্বেচ্ছাসেবক। রক্ত দেখলেই গায়ে কেমন যেন কাঁপুনি হত। রক্ত দেখলেই শিহরিত হতাম। একদিন চাচা বললেন 'ও পজেটিভ' রক্ত ম্যানেজ করে দিতে। আমার রক্তের গ্রুপ "ও" পজেটিভ। রক্তের কাজে আছি তখন মাত্র পনেরো দিন হলো। আমার ওজনও কম। তাই রক্ত আমি দিতে চাইলাম না। শেষ পর্যন্ত একটা বন্ধুকে রাজি করলাম। সে রক্ত দিবে। সবাইকে বলে দিলাম রক্ত ম্যানেজ হয়েছে। সবাই চিন্তা মুক্ত, আমিও চিন্তামুক্ত। আরও দুই ঘন্টা পর রক্ত দিতে হবে।

রক্ত দেওয়ার জন্য ডোনার নিয়া যখন যাব ভাবছি তখন বন্ধু কে ফোন দিলাম। ফোনের রিং এর শব্দটা যতবার শোনছিলাম তত আমার চিন্তা বাড়তে লাগল। ফোন রিসিভ করল না কেউ। আবার কল দিলাম আবারও কেউ রিসিভ না করায় নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। ঘড়ির কাটাটা কেন জানি খুব স্পীডে চলছিল। আমার মোবাইলের রিং বেজে উঠল। মনে শীতলতা অনুভব করলাম ২-৩ সেকেন্ডের জন্য। পরক্ষনেই আমার চোখ ঝাপসা হতে লাগল। চাচার বন্ধুর ফোন। রক্ত উনারই আত্মীয়ের জন্যই দরকার ছিল। লজ্জায় উনাকে কিছু জানালাম না।

বন্ধুকে আরেকটা কল দিলাম শেষ বারের মতো। এবারে সে রিসিভ করলো। বলল তার মা মানছেন না। রক্ত দিতে পারবে না। অনেক রিকুয়েস্ট করলাম লাভ হল না। অনেক বড় একটা বিপদে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম একাজে আমি আর নাই। এটাই আমার শেষবারের কাজ। ছেড়ে দেব। এসব ভাবতে ভাবতে আরেকটা কল আসল,একটু তাড়াতাড়ি যেতে বলছেন চাচার সেই বন্ধু। উপায় না দেখে নিজেই গেলাম রক্ত দিতে।

হাত পা কাঁপছিল। গলা বার বার শুকাচ্ছিল। মনে হচ্ছে যদি পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এসব ভাবতে ভাবতেই হাতের মধ্যে একটা সুচ ঢুকে গেল। কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখি রক্ত যাচ্ছে তার গন্তব্যে। সেদিনের এসব ভাবনা আজ আর আমার মাথায় নাই। রক্ত দিয়ে নিজেকে গাজি মনে হচ্ছিল। কারণ যুদ্ধে আমি শহীদ হইনি। আর একবার যুদ্ধে জয়লাভ করলে পরের যুদ্ধে জয় লাভের তীব্র বিশ্বাস জন্মায়। আর সেই বিশ্বাস নিয়েই আজও আমি চলছি।

'ব্লাড ডোনেশন' শব্দটা শুনছি অনেক আগে, কলেজে পড়ার সময়। মেসে থাকতাম। রাতে এক বড় ভাই বললো উনার আব্বার ক্যান্সার, কয়েক ব্যাগ ব্লাড লাগবে। কিছু না ভেবেই রক্ত দিতে রাজি হয়ে গেলাম।

পরের দিন ভোরে ব্লাড দেয়ার জন্য ল্যাবএইড এ যাচ্ছি। যাওয়ার পথে একজন বললো, আমাদের ব্লাড দেয়া মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। জিজ্ঞেশ করলাম, কেন ? উত্তর আসলো, উনারা তো নাস্তিক! একটা তর্ক বেঁধে গেল। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনিত হইলাম, "মানুষ তো মানুষই"।

প্রথম রক্তদান, একটু তো ভয় লাগবেই। কিন্তু যতটুকু ভয় পেলাম, বাস্তবতা তার চেয়ে অনেক সহজ । ব্লাড ডোনেশন শেষ করে মেসে এসে পত্রিকা খুলেই দেখি ওই দিন 'বিশ্ব রক্তদান দিবস'। অনেক খুশি লাগলো। প্রথম রক্তদান, তা ও আবার এই দিনে।

মজার ব্যাপার হইলো এর কয়েকদিন পরেই আমি একটা টিকা নেওয়ার জন্য ল্যাবএইডে যাই। ডাক্তার আমার ব্লাড টেস্ট করতে বললো। আমি যখন বললাম কয়েকদিন আগে এখানেই ব্লাড ডোনেট করেছি, তখন ঐ রিপোর্টটা সংগ্রহ করে আমার কাজ হয়ে গেল। রক্তদানের উপকারিতা প্রথম বারেই পেয়ে গেলাম! তারপর আর থামায় কে , সেই থেকে শুরু (২০০৯)।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

২০১১ সালের শুরুর দিক। তখন মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে রিল্যাক্সড হলাম।
এরই মাঝে একদিন ছোট বোনদের নিয়ে টিভি দেখছিলাম। টিভিতে ডিশ সংযোগ ছিল না বোনদের পড়ালেখার ক্ষতি হবে বলে। তাই সংগত কারণেই বিটিভি দেখছিলাম। হঠাৎ একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি আসলো, একজন মুমুর্ষ রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন, রক্তের গ্রুপ এ নেগেটিভ। দেখেই মাথায় আসলো, কয়েক মাস আগে আইএইচটি তে ভর্তির সময় আমার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়েছিল যেখানে রিপোর্ট ছিল 'এ নেগেটিভ'। সাথে সাথে ফোনটা হাতে নিয়ে নাম্বারটা ফোনে তুলে নিয়ে সেইভ করে রাখলাম।

এরপর ফ্রি হয়ে কল দিলাম ঐ নাম্বারে, এক আপু ফোনটা রিসিভ করলো। আমি বললাম, আপনাদের এক রোগীর কি 'এ নেগেটিভ' রক্ত লাগবে? উনি বললেন, হ্যাঁ। আপনি কোথায় আছেন এখন?
আমি বললাম, আমি মেরুল বাড্ডায় থাকি। কিন্তু সমস্যা হলো আমার ওজন কম, মাত্র ৪৮ কেজি। আমি কি দিতে পারবো?
উনি আমাকে বললেন, ওজন ৫০ হলে ভাল হয়, তবে ৪৮ হলেও দিতে পারবেন। আমরা এই গ্রুপের রক্ত পাচ্ছি না তো, তাই। আপনাকে আমার এক ভাই মোটরসাইকেলে করে এসে কাল সকালে নিয়ে যাবে। আমি বললাম, কোথায়? উনি বললেন, বারডেম হাসপাতালে। আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে।

ঐদিন অনেক এক্সাইটেড ছিলাম, মনে নিজেকে হিরো মনে হচ্ছিলো। রক্তদানের স্বপ্ন পূরণের আশায় সে রাতে অনেক দেরিতে ঘুম হল। ঘুম হচ্ছিলো না বলে টেবিলে বসে ডায়েরিতে স্মরণীয় দিনটার কথা লিখে রাখলাম। অন্য রকম এক অনুভূতি হচ্ছিল তখন। এরপর যথারীতি শিহাব নামের এক ভাই আমাকে এসে বাসার সামনে থেকে মোটরসাইকেলে করে নিয়ে গেল।

আমার রক্তের গ্রুপ নিয়ে সন্দেহ করছিলাম। আমি বললাম, ভাই আবার একটু চেক করে নিলে ভাল হয়। তারপর তারা খুব শঙ্কিত হলেন। যদি গ্রুপ না মিলে তবে তো আবার রক্তদাতা খুজতে হবে। এরপর রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলাম আমার 'এ নেগেটিভ।
এরপর অপেক্ষার অবসান, ডাক আসলো ব্লাড ট্রান্সফিউশন রুম থেকে। শুয়ে পড়লাম ভয়ে ভয়ে, একটা মোটা সুঁচ রক্তণালীতে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। শুধু একটু চিনচিনে পিঁপড়া কামড়ের মতো ব্যথা অনুভব করলাম। ব্যাগের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অটোমেটিকভাবে ব্লাড নিচের ব্যাগে জমা হচ্ছে। কোন কিছু করা লাগছে না। আমি এর আগে ভাবতাম, রক্ত মানে হয় টেনে বের করে ব্যাগে ভরা হয়। কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো। রক্তদানে কোন কষ্ট নেই, বরং অপার আনন্দ। এরপর রক্তদান শেষে আমাকে কিছু জুস ও পানি খাওয়ানো হল। রেষ্ট নেয়ার পর কেবিনে গিয়ে রোগীকে দেখলাম। রোগী আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। রক্তস্বল্পতা ছিল ওনার। তাছাড়া লিভার অপারেশন করার কথা। রক্তের অভাবে অপারেশন করতে পারছিলেন না।

এরপর বিদায় নেয়ার পালা। আমি বললাম আমাকে দিয়ে আসতে হবে না। আপনি আপনার মাকে সময় দেন, আমি নিজেই চলে যেতে পারবো। এরপর বিদায় নিয়ে পল্টনে অফিসের দিকে রওনা হলাম। যাওয়ার সময়

শিহাব ভাই আমাকে বললেন, ভাই যদি কিছু মনে না করেন, আপনার যাতায়াত ভাড়াটা আমি দিয়ে দিই? আমি তার কথা শুনে তার দিকে তাকাতেই তার চোখে লজ্জা আর কৃতজ্ঞতাবোধ লক্ষ্য করলাম। আমি বললাম, সমস্যা নাই ভাই। আমার কাছে ভাড়া আছে, আমি যেতে পারবো।

তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলাম অফিসে। অফিসের সবাই আমার রক্তদানের কথা শুনে অনেক খুশি হলেন, এবং আমাকে বাহবা দিলেন। সাথে সাথে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে অফিসের বস আমাকে বাসায় গিয়ে রেস্ট নেয়ার জন্য বললেন। আমি এরপর বাসায় এসে রেস্ট করলাম।

প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতা আসলেই অন্য রকম। কখনো ভুলার নয় এ অনুভূতি। আজও সেই মায়ের ছেলেরা আমাকে ফেইসবুকে নক করে খোজ খবর নেয়, বাসায় যেতে বলেন। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আর যাওয়া হয় নি।

রক্তদানে আছে অপার শান্তি আর সত্যিকারের ভালবাসার পরশ। আছে মানবতার এক অপার সমুদ্র।

রক্তদান পেশা নয়, নেশা..!!
যে নেশা জীবন বাঁচায়।

রক্তে অর্জিত বাংলার মাটি, মানব সেবায় করবো খাঁটি।
রক্ত দিন, জীবন বাঁচান।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Sazid Bin Zahid অভিজ্ঞতাঃ ৩৪ (সূচিপত্র)

১৪/১২/১৩ইং অন্যান্য দিনগুলোর মতোই কেটে যেতে পারতো, তবে না, নিয়তই যেন চেয়েছিল আমার লালিত স্বপ্নকে সার্থক করতে।

সবসময় রক্তদানের জন্য একটা সুযোগ খুঁজতাম। এমনটিও না যে সুযোগ আসেনি! তবে বেশ কয়েকবার রক্তদান করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছে। "বি পজেটিভ" রক্তের গ্রুপ হওয়ায় সহজেই জোগাড় হয়ে যেতো। দেখা গেলো আমি পৌঁছানোর আগেই ফোন আসলো রক্তদাতা পাওয়া গেছে বা, ব্লাড ম্যানেজড। একবার এমনও হল, রক্তদান করতে গেলাম ক্রস ম্যাচিং হয়ে গেল। আমি মহাখুশি রক্তদান করবো বলে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে যা হয়! আমার হাতে ৪ বার প্রিকিং এর পরও রক্ত সংগ্রহ করা যায়নি। অনেক আশাহত হয়ে ঘরে ফিরেছি।

কিন্তু যেমনটা বললাম সুযোগ হলো অনেক অপেক্ষার পর ২০১৩ সালে । অনেকেই বলে ১৩ নাকি unlucky তবে আমার জন্য ছিলো super lucky। রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী চলছিল। আমি ছিলাম স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। এক পর্যায়ে একজন মেডিকেল পড়ুয়া বড় ভাইকে জানালাম আমার ইচ্ছার কথা। তিনি আমার কথা শুনে অনেকটা আবেগ আপ্লুত হয়ে গেলেন। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন আজ আমার প্রথম রক্তদান হয়ে যাবে। যেমন কথা তেমনই কাজ। আমার রক্তদান সম্পন্ন হলো।

রক্তদানের পর আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম। সবাই আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আমার অনেক বন্ধু সেদিন আমার পর রক্তদান করেছে। একজন আপুও এগিয়ে এসেছিলো। মূলত সেদিনটার কথা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। তাও চেষ্টা করছি নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে। যদি লিখাটি পড়ে একজনও রক্তদানে এগিয়ে আসে তাহলেই আমার সার্থকতা ।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Sabyasachi Chakma অভিজ্ঞতাঃ ৩৫ (সূচিপত্র)

জীবনে প্রথম ব্লাড দিলাম তাও ভালবাসা দিবসে। সকালে ৯ টার সময় বন্ধু মিকি কল দিয়ে জানালো রক্ত দিতে হবে। প্রথমে একটু চিন্তায় পরে গেলাম। প্রথমবার রক্তদান করবো বলে কথা। এসেছি সেমিস্টার ব্রেকে তাও ভাম্পায়ারটা শান্তি দিলো না। আমারে নানা কারণ দেখিয়ে রাজি করালো। ছুটিতে এসেছি তাই কাপড়-চোপড় সব ধুতে দিয়েছি, ঘর থেকে তো লুঙ্গি পরে বের হওয়া যায় না! শেষমেশ থ্রী-কোয়াটার একখানা পরেই হাসপাতালে গেলাম।

গিয়েই দেখি আমারে বোকা বানিয়েছে মিকি। বলেছিল একটা মহিলার ডিলিভারীজনিত রক্ত দরকার, তবে রক্তদান করতে হলো একজন রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত পুরুষকে। যাইহোক, আমি রক্তদান করে গর্বিত। দেয়ার আগে কখনো চিন্তাও করিনি, আমাকে দ্বারা এই কাজ সম্ভব! আমাকে দেখলে যে কেউ বলতে পারে, এই পোলা অনন্ত জলিল হতে পারে, মাগার ব্লাড দেয়া অসম্ভব ব্যাপার। অনন্তের six pack হতে পারে! আমি zero pack এ কম কিসে? ব্লাড দেয়ার আগমূহুর্তে কেন জানি খুব হাসি পাচ্ছি। Fearless ছিলাম. Test করলো, খুশি হলাম AIDS নাই। যাক, Needle push করলো। ধূররর! এটা কোন ব্যাথা হলো!

ব্লাড দিয়ে ভালই লাগল। অন্তত একজনের জীবন বাঁচাতে পারলাম। সারাদিন কার্টুন নিয়ে থাকি তাই লিখাটাও আমার কমিকস্ এর স্ক্রিপ্ট এর মতো করে লিখলাম।

Moral: মানুষের শরীর ছোট হলেও, ভেতরটা বড়।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Adrita Aditya অভিজ্ঞতাঃ ৩৬ (সূচিপত্র)

তারিখঃ ০৯/০৪/২০১৫ । প্রতিদিনের মতো সেদিন ও ক্লাস করছিলাম। হঠাৎ খবর পেলাম এক ডায়ালাইসিস রোগীর জন্য ও+ পজেটিভ রক্ত দরকার। অনেক জায়গায় খোঁজ করেও রক্ত ম্যানেজ হয়নি। এদিকে রোগীর অবস্থা ও তেমন ভালো না।

--অদ্রি শোন।
--হ্যাঁ বল।
--তুই রক্ত দিয়ে দে। তোর রক্তের গ্রুপ তো একই।
-- আমিতো আগে কখনোই দেই নি রে। যদি কোন সমস্যা হয়?
--আরে না। সমস্যা হবে কেন? আমি তো প্রতি তিন মাস পর পর দেই।
--আচ্ছা চল তাহলে বেরিয়ে পড়ি।
কথোপকথন হচ্ছিলো আমার আর আমার এক বন্ধুর সাথে।

একসাথে যখন হাসপাতালে যাচ্ছিলাম তখন ও আমাকে নির্ভয় দিয়ে যাচ্ছিল। যেহেতু প্রথম রক্ত দিবো তাই অল্প ভয় আর কিছু কৌতুহল কাজ করছিলো। পৌঁছে গেলাম সদর হাসপাতালে। প্যাথলজি রুমে ঢুকে শুয়ে পড়লাম রক্ত দেয়ার জন্য।

আসলেই অনেক ভালো লাগছিলো। যারা রক্ত দিয়েছেন তারাই শুধুমাত্র এই অনুভূতিটা অনুভব করতে পারবেন। . রক্ত দেয়া শেষ হলে ১৫/২০ মিনিট বিশ্রাম নিলাম। তবে কোন রকম সমস্যা হয় নি। মনে হচ্ছিলো এতো দিনে কাজের মতো কাজ করলাম। আমরা রক্ত দিয়ে মানুষকে সাহায্য করছি।আপনারাও আমাদের সাথে এগিয়ে আসে। আপনার একটু খানি রক্তে হয়তো বেঁচে যাবে কিছু প্রাণ। আর তাই আমাদের স্লোগান "রক্ত দিন জীবন বাঁচান।

রক্ত দিন জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Mahadi Hassan অভিজ্ঞতাঃ ৩৭ (সূচিপত্র)

আমার প্রথম রক্তদানের ঘটনাটি খুবই সাধারন। এখানে আমার নিজের অনুভূতিটা ই ছিল শুধু একটু ভিন্ন। তাছাড়া আর তেমন কিছুই নয়। তাই আমি শুধু আমার প্রথম রক্তদানের ঘটনা ছাড়াও আরো কিছু রক্তদান সম্পর্কিত ঘটনা এখানে শেয়ার করবো। তবে শুরু টা প্রথম টা দিয়েই করছি।

আমার প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতা হয় ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেদিন ঢাবিতে আমার ভর্তি পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমি আর আমার একজন বন্ধু চলে গেলাম বইমেলাতে। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাত চোখে পড়লো স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী চলছে। আমি একটু উৎসুকভাবে সেখানে গেলাম। তখন সেখানে কর্মরত ভাইয়া আমাকে জানালেন যে, আমি যদি স্বেচ্ছা রক্তদান করি তাহলে আমাকে তারা আমার রক্তের গ্রুপসহ আরো কিছু রোগের ভাইরাস আছে কিনা তা পরীক্ষা করে জানাবে। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই রোমাঞ্চকর মনে হল। আমি আমার বন্ধুকে বললাম, আয় আমরা রক্তদান করি। এতে কারো রক্ত লাগলে তার উপকারও করা হবে, আর আমরা আমাদের রক্তের গ্রুপ আর রক্ত পরীক্ষাটাও করে নিতে পারবো বিনামূল্যে। আমরা দুই বন্ধু মিলে দুই ব্যাগ রক্ত দান করে ফেললাম এবং জীবনে প্রথমবারের মত জানতে পারলাম, আমার রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ। বাসায় এসে প্রথম রক্তদানের অনুভূতি মায়ের সাথে শেয়ার করার পর মা'র অনেক বকা শুনতে হয়েছে... এখন পর্যন্ত মা'র কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি ৯ বার রক্তদান করতে পেরেছি।

আমি আরেকটা ঘটনা শেয়ার করি। ঘটনাটি খুব সম্ভবত ২০০৮ সাল এর দিকের। আমার খুব কাছের একজন বন্ধুর ভাবির ডেলিভারি কেসের জন্য ও পজিটিভ রক্ত লাগবে। আমি বললাম, আমি রক্তদান করতে পারবো। সকালে আমি হাসপাতালে যাওয়ার পর শুনলাম ভাবীর অবস্থা একটু খারাপ। ডাক্তার রক্তের জন্য অপারেশন শুরু করতে পারছেনা। আমি রক্তদান করে ভাইয়ার সাথে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে চলে আসলাম। এই পর্যন্ত ঘটনা খুবই সাধারন ছিল। কিন্তু এই ঘটনার প্রায় বছর খানিক পরে, আমার সেই বন্ধুর পারিবারিক এক বিয়ের দাওয়াতে আমি যাই। আমরা বন্ধুরা আড্ডা দেয়ার সময়, হঠাৎ করে বন্ধুর সেই ভাই, ভাবীকে নিয়ে এসে আমার সামনে এসে বলল এই হচ্ছে সে, যে তোমাকে রক্তদান করেছিল। ভাবীর কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন সেই মুখ দেখে আমি অবাক না হয়ে পারিনি। যদিও এর থেকে বেশী কিছু আমার জন্য যে তখনো অপেক্ষা করছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন ভাবী এবং তার পরিবারের মুখোমুখি হই, তখন ভাবী সবার সামনে তার আসন ছেড়ে দিয়ে আমাকে যখন বসতে বলল... আর সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল এই বলে যে " এই হচ্ছে জুয়েলের বন্ধু "রানা" যে সেদিন আমাকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিল।"
উপস্থিত সবাই যেভাবে আমাকে সম্মান দিচ্ছিল। তখন আমি অনুভব করেছিলাম একজন রক্তদাতা কতটা সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। রক্তদাতারা একজন রক্তগ্রহিতা এবং তার পরিবারের কাছে সবসময়ই একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব, একজন সেলিব্রেটি, একজন সুপার হিরো বা হিরোইন। মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে চিরকাল অমর হয়ে বেঁচে থাকে। রক্তদান তেমনই এক কর্ম যা করা খুবই সহজ এবং সাধারণ কিন্তু যার ফলাফল ভয়ানক রকমের অসাধারণ।

রক্তদাতাঃ রাজু অভিজ্ঞতাঃ ৩৮ (সূচিপত্র)

২০১০ সাল। রাত তখন ৩টা কি ৪টা। গভীর ঘুমে মগ্ন। হঠাৎ আমার খুব কাছের বন্ধু উজ্জ্বলের ফোন। কানের পাশে মোবাইল বেজেই যাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে ফোন রিসিভ করলাম।
ওপাশ থেকে উজ্জ্বল কান্না জড়িত কন্ঠে বলল, তুই তুই কোথায়?
আমি বললাম, আমি বাসায় ঘুমাচ্ছি। কি হয়েছে তুই কান্না করছিস কেন?
সে বলল, আমার স্ত্রীর ব্লিডিং হচ্ছে। বাচ্চা মারা গেছে। ডাক্তার বলেছে দ্রুত রক্ত ম্যানেজ করতে না পারলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার রক্তের গ্রুপ কি। আমি বললাম আমি জানি না। কোন সময় টেষ্ট করিনি। তোর স্ত্রীর ব্লাড গ্রুপ কি? সে বলল "বি পজিটিভ"। অনেক জনকে টেষ্ট করিয়েছে কিন্তু কারো সাথে মিলছে না। আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, দাড়া, আমি আসছি।

ঘুম থেকে উঠে পাশে থাকা দুইজন রুমমেটকে সাথে করে রওনা দিলাম চট্রগ্রাম মেডিকেলের উর্দেশ্যে। রাস্তায় গাড়ী পেতে অনেক কষ্ট হল, তার উপর শীতের রাত। প্রচুর ঠাণ্ডা পড়েছে।

মেডিক্যালে পৌঁছে আমরা তিনজনসহ মোট ছয়জনের ব্লাড টেষ্ট করা হলো যার মধ্যে একমাত্র আমিই সেই ভাগ্যবান ব্যাক্তি যার ব্লাড গ্রুপ বি পজিটিভ। উজ্জ্বল আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল। আমি বললাম, চিন্তা করিস না। আমার সাথে যখন মিলেছে তুই ব্লাড পাবি।

কিন্তু এদিকে আমার হার্ডবিট বেড়ে যাচ্ছে ভয়ে, কারন আগে কোনদিন কাউকে রক্ত দেইনি। আজই প্রথম হতে যাচ্ছে। শেষমেশ রক্তদান করলাম। সে আমার জন্য ফলমূল এবং নানা কিছু নিয়ে এলো। আমি তার কিছুই খেলাম না কারন সেটা যদি প্রতিদান হয়ে যায় সেটা ভেবে। নিজে পানি কিনে খেলাম, তারপর রোগীর খোঁজখবর নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।
সেই থেকে শুরু আমার রক্তদান করা এই পর্যন্ত ২০ বার রক্তদান করেছি। ২১ বারের অপেক্ষায় আছি। ইচ্ছা আছে শততম রক্তদান করার, বাকিটা সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করছে।

সালটা ছিল ২০০৭। আমার বাবা খুব অসুস্থ, উনার দুটো কিডনি নষ্ট। হাসপাতালে আনা হয়েছে। বাবার ডায়ালাইসিস করা লাগবে। তাই একটা অপারেশন করা লাগবে, ক্যাথেলার স্থাপন করা হবে শরীরে। আমি বাবার বেডের পাশে শুয়ে আছি আর মা আছেন বাসায়। ডাক্তার এসে বলল, আপনার বাবার রক্ত লাগবে এখনি। উনার গ্রুপ বি পজিটিভ। আমি তো আসলে বুঝতে পারছিনা কি করবো। আমি স্কুলে স্কাউট করতাম। তাই আমার মনে আছে যে আমার রক্তও বি পজিটিভ।

ডান বাম আর চিন্তা না করে বাবা কে বললাম, বাবা তুমি একটু ঘুমাও। আমি এখনি আসছি ।
বাবা বলে, কোথায় যাচ্ছো?
আমি বললাম, বাবা তোমার রক্ত লাগবে, তাই ম্যানেজ করতে যাচ্ছি।
আমি জানি আমি যদি বাবাকে বলি যে, আমি তোমায় রক্ত দিবো, তাহলে বাবা কোনদিন আমায় রক্ত দিতে দিবে না। তাই উনাকে না বলে চলে গেলাম প্যাথলজীতে ।

আমি প্রথম আজ রক্ত দান করবো মনে অনেক ভয়। আমার রক্ত যে ব্যক্তি টেনে দিবে উনি আমায় বলল, বাবা, তুমি কাকে রক্ত দিবা ? আমি বললাম, চাচা আমার বাবা খুব অসুস্থ । উনার জন্য রক্ত লাগবে।
আমায় উনি বলল, বাবা, তোমার কপাল অনেক ভালো যে তুমি তোমার বাবাকে রক্ত দেবার সুযোগ পেয়েছ। সবার কপালে বাবা এমন সুযোগ আসেনা। আমি আর কোনো কথা চিন্তা না করে শুয়ে পড়লাম। আমার রক্ত টানা শেষ। কিছু সময় রেষ্ট নিয়ে আমি আমার রক্তের ব্যাগ হাতে নিয়ে অনেক সময় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার পর সেই চাচা আমায় বলল, বাবা তুমি যাও। আমি তোমার রক্তটা ফ্রিজে রেখে দেই। অপারেশনের সময় দিবো। আমি তখন উনার কাছে দিয়ে বাবার পাশে এসে বসলাম।

বাবা আমায় দেখে উঠে বসলেন আর বললেন, রক্ত কি পেয়েছিস? আমি মুছি হেসে বললাম, পেয়েছি বাবা ।
উনি আবার বললেন, কোথায় পেলি? কে দিলো?
আমি বললাম, বাবা তোমার রক্তই একজনের শরীরে ছিল। তার বিন্দু মাত্র সে তোমায় ফেরত দেবার সুযোগ পেয়েছে। সেই সুযোগ সে ছাড়েনি।
বাবা বললেন আমি ঠিক বুঝলাম না যে তুই কি বলছিস?
আমি বললাম, তোমার বোঝা লাগবেনা। তুমি শুয়ে থাকো।

কিছু সময় পর ডাক্তার এলেন বাবাকে অপারেশন থিয়েটারে নেবার জন্য। বাবাকে যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন বাবা ডাক্তারকে বলল, ডাক্তার আমার জন্য যে রক্ত দিলো সে কে ? ডাক্তার বলল, আপনার ছেলে।
তখন বাবা আমার দিকে চেয়ে আছে আর কেবিন বয় বাবাকে হুইল চেয়ারে করে অপারেশন থিয়েটারের দিক নিয়ে যাচ্ছে। বাবা অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে অব্দি আমার দিক ভেজা চোখে তাকিয়ে ছিল।

বাবা তুমি নেই কিন্তু তোমার ছেলে আজও সবাইকে তুমি মনে করে রক্ত দান করে যাচ্ছে। আমার জন্য দোয়া করো বাবা।

রক্তদাতাঃ Mehedi Hasan অভিজ্ঞতাঃ ৪০ (সূচিপত্র)

সময়টা ২০১২ সালের একেবারের শুরুর দিকে। ঢাকায় নতুন এসেছি। আপাতত ফ্রেন্ডের মেস এ উঠেছি। ছেলেপেলে পুরোটা রাত ২৯ খেললো আর আমি একজনের ল্যাপটপ নিয়ে মুভি দেখি আর ঝিমাই। হঠাৎ ভোরবেলা পাশের রুম থেকে এক ভাই এসে বলল কারো রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ কিনা। আমি আগে কখনো রক্ত দেইনি তাই চুপ করে আছি। সে খুব উৎকন্ঠায় বললো রোগী নাকি এক্সিডেন্ট করেছে। রক্ত ছাড়া বাঁচানো সম্ভব না। আমার মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইবার আমি বলেই ফেললাম আমার রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।

যাই হোক ওই ভোরবেলাতেই রওনা হলাম। শিশুমেলার অপর দিকে ট্রমা সেন্টারে। তো গিয়ে দেখি আরেকজন ডোনার এসেছে। ব্লাড দিতে। যেহেতু আমি আগে কখনো দেইনি। আমি বললাম, আগে উনি দিক তারপর আমি দিব। ওই ডোনারটিও আমার মতো ভার্সিটি স্টুডেন্ট। দেখলাম কি যেন হাতের মধ্যে গুজে দিয়ে শুধু প্রেস করতে বলল। এক ব্যাগ রক্ত ভরতে প্রায় দশ-বার মিনিট লেগেছিল। ততক্ষণে আমার টেস্ট রিপোর্ট চলে এসেছে। আমার বাম হাতে যখন সুইটা ফুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল, আমার এখনও মনে আছে আমি অন্যদিকে তাকিয়ে আল্লাহু আকবর বলছিলাম শুধু। এর পরে সেই পাঞ্চিং বলটা আমার মুঠোয় দেওয়া হল। বেশি না এই তিন-চার মিনিট পরেই বলল, হয়ে গেছে, ওঠেন। আমি পুরো অবাক। জিজ্ঞাসা করেই বসলাম কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা। উনি বললো ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেছে। আবার বললাম ওই ভাইয়ের এতক্ষণ লাগল কিন্তু আমার এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল! তখন নার্স বললো, ওই ভাই অনেক হেংলা পাতলা ছিল বলে শরীরে রক্তও কম ছিল। কিন্তু আমি নাকি বেশ নাদুসনুদুস আর দ্রুত পাঞ্চ করার ফলে খুব দ্রুত রক্তের ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেছে।

জীবনে প্রথমবার রক্তদান কিন্তু খুব খারাপ লেগেছিল। অনুভুতিটা ভালোভাবে অনুধাবন করার আগেই ফিলিংসটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। আর কিছুদিন পর দশমবার রক্তদানের নিজস্ব মাইলফলক স্পর্শ করব।

নোট: খুব মারাত্মক এক্সিডেন্ট এর কারণে রোগীর সাথে দেখা করতে পারিনি। তবে আলহামদুলিল্লাহ তিনি এখনো বেঁচে আছেন।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

একদিন নিয়ত করি রক্ত দিবো। সেদিনই রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করালাম, আমার রক্তের গ্রুপ ও পজেটিভ।

কয়েকজনকে নাম্বার দিলাম, রক্ত লাগলে ফোন দিতে বলেছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক ভয় কাজ করছে। একটা ফোন আসলো, আমি বলছি দিবো। কিন্তু অনেক ভয় করছে। ফোনটা বন্ধ করে রাখলাম যাতে ফোন না দিতে পারে। ঘন্টাখানেক পর মনে হইলো, না এটা ঠিক হচ্ছে না। ফোন খুলে ওই নাম্বারে ফোন দিলাম, বলল রক্ত ম্যানেজ হয়েছে।

আবার আরেকদিন আরেকটা ফোন আসলো, ওয়াদা দিছি রক্ত দিতে যাবো। রিক্সায় উঠছি, রক্ত দিতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু অনেক ভয় হচ্ছে। মনে মনে খুব চাচ্ছিলাম, যাতে একটা ফোন আসে, বলে ভাই রক্ত ম্যানেজ হয়েছে। লাগবে না। ঠিকই মাঝপথে ফোন আসলো, হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আরেক ফ্রেন্ডের চাচার রক্ত লাগবে, ল্যাবএইডে। গেলাম রক্ত দিতে, কিন্তু আমার কলিজা কাঁপছে। একবার ভাবলাম পালায় যাই। আমার খুবই ভয় হচ্ছে, মনে মনে চাচ্ছিলাম আল্লাহ আমারে বাঁচাও।
শেষ মূহুর্তে খবর আসলো, আজ আর রক্ত লাগবে না, কাল আসতে। পরের দিন অজুহাত দিয়ে ভেগে গেলাম। রক্ত দেইনি, মনে হচ্ছিল ভয়ে আমি হার্টফেল করবো।

এভাবেই কেটে গেল কয়েকটা মাস। একদিন মাগরিবের পর মাদ্রাসা মসজিদের বারান্দায় দেখি এক ভাই কাঁদছে, কয়েকজন তার সাথে কথা বলছে। কাঁদার কারন জানতে চাইলাম, জানলাম, তার মা ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি। আগামিকাল অপারেশন, ও পজেটিভ রক্তের দরকার কয়েক ব্যাগ কিন্তু পাচ্ছেনা।
ওই ভাইয়ের চোখের পানি দেখে ঠিক থাকতে পারিনি। আমরা চারজন ছিলাম ও পজেটিভ,কেউই প্রস্তুত না। কিন্তু আমি প্রস্তুত ছিলাম, নিয়ত করে ফেলেছি, আজ যেভাবেই হোক, রক্তদান করবো। তাতে যদি আমার মৃত্যুও হয়ে যায়, হোক।

রক্তদান করতে গেলাম, অনেক লেট হচ্ছে। আমি পণ করছি, সারারাত লাগলে লাগুক, আজ রক্তদান করবোই করবো। এতোকিছুর পরও কিন্তু ওই ভয়টা দূর হচ্ছিলো না। যখন সুই ধুকাবে, তখন অন্যদিকে ফিরে চোখমুখ বন্ধ করে, দাঁতে দাঁতে খিট মেরে ছিলাম। সুইটা যাওয়ার পর অল্প সময়েই রক্তদান শেষ হল। মনে হল রক্তদান করিইনি, একেবারেই স্বাভাবিক।

নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছিল। ইসস! সামান্য ব্যাথাকে, এতো ভয় পাচ্ছিলাম?? (এটা আমার কাছে ব্যাথাই না, অনেক সময় উষ্ঠা খাইয়াও এর চাইতে বেশী ব্যাথা পাই)। আরও আগে যদি এই ভয়টা জয় করতে পারতাম, তাহলে আরও কয় ব্যাগ রক্ত দিতে পারতাম, কতগুলা মানুষ উপকৃত হতো। এত ভালো লাগছিল লিখে বুঝানো যাবেনা, ঈদের চাইতেও বেশী খুশী। সবাইতো খুব অবাক, আমার অবস্থা দেখে। সেদিনটাকে আমার আজীবন মনে থাকবে, এই খুশীতে ছোটখাটো একটা পার্টিও দিয়েছিলাম।

রক্তদাতাঃ Shoeb Ahmed অভিজ্ঞতাঃ ৪২ (সূচিপত্র)

২০০৮ সালে আমি তখন ক্লাস ৮ এ পড়ি। একদিন আমার চাচাতো ভাই সাদ এর ব্লাড কান্সার ধরা পড়ল। ওর জন্য রক্ত যোগার করার জন্য অনেক হিম-সিম খেলাম। একদিন রক্ত যোগার করার জন্য শান্তি নগর থেকে বেইলি রোড সেখান থেকে হেটে দুই হাতে রক্তের ব্যাগ নিয়ে হেটে হেটে পিজিতে হাসপাতাল আসলাম। অনেক কষ্টই হয়েছিল রাস্তা পার হতে, অনেক ছোট ছিলাম। পরদিন দুপরে আমার ভাই মারা যায়। সেই থেকে আমি শপথ নিলাম বয়স ১৮ হলে ও যতো দিন সুস্থ থাকবো তত দিন রক্ত দিয়ে অন্য কে সাহায্য করব।

২০১০ এর ৯ই অক্টোবর খুব সকালে বাবা এসে বলেন এক আঙ্কেলের সদ্য জন্ম নেয়া বাচ্চার জন্য রক্ত লাগবে। বাবা বলেন এক সিরিঞ্জ ই লাগবে। তাই গেলাম একটুই তো দিবো। যে শুনি এক ব্যাগ লাগবে। একটু ভয় পেয়ে গেলাম। সাহস করে শুয়ে পরলাম বেডে। সুঁই পুশ করার সময় আমার ভাইয়ের মুখখানা চোখে ভাসছিল, মনে করে নিলাম আমার ভাইকেই রক্ত দিচ্ছি।

রক্ত দিয়ে বের হয়ে সকালের নাস্তা করে চলে আসলাম। সন্ধ্যায় মা ফোন দিল বাসায় আসার জন্য। ফোন টা রাখার আগে মা আফসোস করে বলে, আহা শোয়েব! সেই বাচ্চাটা মারা গিয়েছে। বলেই রেখে দিল। ফোন রাখার পর খেয়াল করলাম কথাটা। তখন বাচ্চা শিশুর মত অঝোরে কাঁদা শুরু করে দিলাম।

সেই থেকে পথ চলা প্রতিবার রক্ত দিতে যাই এবং প্রতিটি সূচের খোঁচায় যেন আমার ভাইয়ের মুখখানা ভেসে উঠে। বারটি বার রক্তদান করে ফেলেছি। এই যাত্রায় ১০০ পার করতে চাই ইনশা আল্লাহ। আমি পারবো। সবার কাছে দোআ চাই এ জন্য।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ হিম শুভ্র অভিজ্ঞতাঃ ৪৩ (সূচিপত্র)

দিন, মাস, সাল- কিছুই মনে নেই, কারণ তখন রক্তদান সম্পর্কে এতটা সচেতন ছিলাম না, তাই মনে রাখাটা জরুরী মনে করিনি।

একদিন সন্ধ্যা বেলা বন্ধুদের আড্ডায় বসে ছিলাম, পরিচিত এক বড় ভাইয়ের ফোন এল। তার বন্ধুর মায়ের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ এ+। যদি কেউ পরিচিত থাকে তবে খোঁজ নিয়ে দেখার জন্য বলল। নিজের রক্তের গ্রুপ আগে থেকেই জানা ছিল। তাই বড় ভাইটাকে বললাম আমার নিজের রক্তের গ্রুপই তো এ+। তিনি বলল আমি দিতে পারবো কিনা। আমি সাথে সাথে রাজী হয়ে বললাম, হুম দিবো।

কিছুক্ষণের মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল চলে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর বড় ভাইটি আর উনার বন্ধু মিলে নিয়ে গেলো ব্লাড ব্যাংকে। ঐখানে ঢুকার পর কিছুটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। চিন্তা করছিলাম কোন প্রবলেম হবে না তো! এসব ভাবছিলাম, আর অন্যান্য ডোনারদের দিকে দেখছিলাম তাদের অবস্থা। তাদের পর্যবেক্ষণ করাতে আমার একদিকে সুবিধা হল, মানসিক ভাবে নিজেকে শক্ত করতে পারলাম। তখন মনে হচ্ছিল, আরে এতো একদম সোজা। কোনো কষ্টই তো নেই। তারপর আমার হাতে সুই ঢুকানোর জন্য একজন প্রস্তুত। আমি ভয় পাবো ভেবে আমাকে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে বলা হল, কিন্তু আমি তাকিয়ে ছিলাম হাতের দিকে। লাল পিপড়ার কামড়ের চেয়েও কম ব্যথা পেলাম। তারপর শুরু হলো ব্লাড বের হওয়া। এক ব্যাগ হতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই, তবে সুইটা বের করার সময় ব্যথা পেয়েছিলাম। তারপর শুয়ে থেকে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চলে আসলাম বাইরে।

প্রথমেই ডাবের পানি খেয়ে শেষ করলাম। রোগীর ছেলে তো আমাকে মাথায় তুলে রাখার মতো অবস্থা। উনার আম্মুকে দেখতে গেলাম, কথা বললাম, সময়টা খুব ভালো লাগছিল। বড় ভাইটা বলেছিল, বাসায় গিয়ে রেস্টে থাকতে, কিছুটা দূর্বল লাগতে পারে। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র দূর্বল লাগেনি। তবে মানসিক ভাবে একটা আনন্দ ছিলো আমার কাছের বন্ধুদের মধ্যে সবার আগে আমিই রক্তদান করেছি, আমার তখন মনে হচ্ছিল, আমি অনেক বড় একটা কাজ করে ফেলেছি।

এটাই ছিলো আমার প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতা, সেই থেকে শুরু, এক ব্যাগ-এক ব্যাগ করে ১৩ বার দেয়া হয়ে গেল। আর সর্বশেষ ১০-০২-১৬ তে একটি ১৪দিনের বাচ্চা কে ৪০ml ব্লাড ডোনেট করলাম। যতদিন সুস্থ থাকবো ততোদিন প্রতি ৩/৪মাস পর পর রক্তদান করব।

#Happy_Blood_Donating
#রক্ত_দিন_জীবন_বাঁচান

রক্তদাতাঃ তাজনুভা তাসকিন তাহিয়া তিস্তা অভিজ্ঞতাঃ ৪৪ (সূচিপত্র)

খুব সহজে রক্ত দেয়া হয়নি আমার। এতটাই আনলাকি ছিলাম। আমার বয়স তখন ১৬ যখন দেখতাম সবাই কত আগ্রহ নিয়ে রক্ত নিয়ে কাজ করে, রক্ত দান করে, আমি তখন থেকে অনুপ্রেরণা পেতাম। কিন্তু জানতাম না আমার রক্তের গ্রুপ কি! পরে একদিন সরকারি মেডিক্যালে গিয়ে তাদের যখন বলি, আমার রক্তের গ্রুপ কি তো জানিনা একটু চেক করে দিন। তারা বললো শনিবার ছাড়া হয়না। খুব মন খারাপ হল। কারণ শনিবার আসতে আরো ৪ দিন লাগবে। এরপরও অপেক্ষা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হলোনা আর, পাশে হাসপাতালে গিয়ে ব্লাড গ্রুপিংটা করিয়েই ফেললাম। বাসার সবার গ্রুপ বি পজেটিভ। আমি ও ভেবেছিলাম আমারো হয়তো তাই হবে কিন্তু রিপোর্ট পেয়ে একটু খুশিই হয়েছিলাম কারণ আমি সর্বজনীন গ্রহিতা এবি পজেটিভ।

আমার জন্মদিন ছিল সেদিন। ১৮ বছরে পা দিয়েছি। ব্লাড দিতে চাইলাম পরিবার বাধা দিল। খুব কান্নাকাটি করেও লাভ হল না। ১৮ হওয়ার পরও অনেক বার ব্লাড দিতে চেয়েও দিতে পারিনি পরিবারের জন্য। এক সময়ের কথা সেদিন এক পিচ্চিকে ব্লাড দিতে চেয়েছিলাম। আবার ফ্যামিলি থেকে বাধা। শেষে প্রতিজ্ঞা করেছি লুকিয়ে যাব কাউকে না বলে।

আর আমার সে প্রতিক্ষার দিনটা এসেছিল ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬ তে। আমার বয়স তখন ১৮ বছর ৯ মাস। আমার লাইফের সেরা একটা দিন এই দিনটা। এর আগের দিন এক পরিচিত ভাইয়া কল দিয়ে বলল তার ভাগ্নে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। আমি বললাম, আমিই দিব। সকালে বাসায় কাউকে কিছু না বলে চলে গেলাম ব্লাড দিতে। মোবাইলও অফ করে রাখলাম যেন মিথ্যা না বলতে হয় বাসায়। ব্লাড দিয়েই যেন বাসায় গিয়ে সবাইকে বলতে পারি যে আমার প্রতিক্ষা আজ শেষ হয়েছে। হুম এরপর আমার থেকে যখন ব্লাড নেয়া হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমি জান্নাতে আছি। দুনিয়ার জান্নাত। এত আনন্দ এত শান্তি আগে কখনো লাগেনি। পরে বাসায় এসে সবাইকে বলার পর তাদের কোন প্রতিক্রিয়া দেখলাম না বরং খুশি হয়েছিল।

রক্ত দানের মাধ্যমে মানুষ হিসেবে নিজেকে সার্থক করেছিলাম সেদিন। ইনশাল্লাহ যতদিন বেঁচে থাকব আর সুস্থ থাকব ততদিন রক্ত দিয়ে যাব। আর অনুভব করব দুনিয়ার জান্নাতি সুখ।

রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচাই

ইচ্ছা ছিল রক্ত দেব, তাই সেদিন ক্লাসমেটটি যখন বলল তার আন্টির (এ পজেটিভ) রক্ত প্রয়োজন সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলাম। একদিন এক ছেলে তার মায়ের জন্য রক্ত খুঁজতে কলেজে এসে আমার হাত ধরে অনেক কেঁদেছিল, আমি রক্ত যোগার করে দিয়েছিলাম, সেদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল রক্ত দেবো।

যাহোক, বন্ধুটি আমাকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলো। গ্রুপ টেস্টের পর আমার রক্ত দেয়া শুরু হলো। ধারনা ছিলো আমি রক্ত দিলেই দূর্বল হয়ে যাবো এবং মনে মনে সেটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু এমন হলো না। রক্তদান শেষ হলো তবুও শরীর ঠিকঠাক । সবাই আমাকে রেস্ট নিতে বলল কিন্তু আমি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জুসের বোতল শেষ করছি। এক সময় মেসে পৌঁছে গেলাম তবুও শরীর ঠিকঠাক।
সোজা ক্রিকেট মাঠে গিয়ে খেলতে শুরু করলাম আজ শরীরটা অন্য দিনের তুলনায় বেশ হালকা। ঘন্টাখানেক পর রোগীর আত্মীয়রা আমায় দেখতে গেলো ফল নিয়ে তখনও আমি খেলছি, ফলের সাথে কিছু বকুনিও ফ্রি পেলাম।

(প্রথম রক্তদানের শিক্ষাঃ রক্তদানে শরীর হয় হালকা আর মন হয় ফুরফুরে।)

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

২২ ই এপ্রিল ২০১৪ ইং, সকাল ১০ টা। বন্ধু রনজিতের ফোন,
- কিরে কই তুই?
- এইতো আমি হলে ৩২০ নং রুমে ঘুমাইতাছি।
- ভালো, তোর রক্তের গ্রুপতো এবি পজেটিভ (AB+) তাই না?
- হুম, (বলা বাহুল্য রনজিত মোটামুটি আমাদের ক্লোজ সবার রক্তের গ্রুপ জানে)
- তো দিতে পারবি?
- আমি রাজি..!! তো কার লাগবে?
- আরে আমাদের নাহিদের এক আত্নীয়ের জন্য। আমি তোকে হসপিটালে নিয়ে যাবো টেনশন নিস না।
- ওকে তুই আমাকে কল দিস তাহলে।

সত্যি বলতে কি আমি একটুও ভয় পাইনাই এতে। রনজিত নিজে আমাকে হসপিটালে নিয়ে যায় এবং রক্ত দেওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলো সে। তারপর রক্ত নিবে ,আমাকে বলার সাথে সাথেই লম্বা হয়ে শুয়ে গেলাম ব্লাড কালেশন রুমের বেডে । আসলে মোটা সুইটা দেখলে যে কারোরই প্রথম প্রথম ভয় পাওয়ার কথা, আমি উপর দিয়ে যদিও বলছিলাম ভয় পাই না, ভিতরে ভিতরে একটু ভয়তো পেয়েইছিলাম। সুইটা হাতে ডুকানোর সময়ে একটু ব্যাথা লেগেছে এই যা আর কিছুই মনে হয়নি আমার। ৪/৫ মিনিটেই আমার রক্তে ভরে গেল ব্যাগ টা। তারপর দশ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে এবং হাফ লিটার পানি পান করে গেলাম ওই দাদুর বয়সী মহিলার কাছে। কি বলবো, ওনার হাত যখন আমার মাথায় বুলিয়ে দেয়, তখন মনে হইছে আমিই পৃথিবীর সেরা সুখী মানুষ এবং ওনার দোয়া করা দেখে ওইদিনই প্রতিজ্ঞা করে পেলছি প্রতি চারমাস পরে পরে শরীর সুস্থ থাকলে ইনশাআল্লাহ্ এইভাবেই রক্ত দিয়ে যাবো মানুষদের।

আর একটা কথা নিন্দুকদের কথা শুনবেন না, তারা সব সময়ই এইসব কাজের সমালোচনা করবে, এদের কথায় কান দিবেন না।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Muktara Begum অভিজ্ঞতাঃ ৪৭ (সূচিপত্র)

আমার বয়স তখন আঠারো বছর সাত মাস, কলেজে পড়ি। লায়ন্স ক্লাব থেকে একটা স্বেচ্ছাসেবী দল গিয়েছিল ব্লাড ক্যাম্পেইনে। যথারীতি আমি ভলান্টিয়ার।

ছোটবেলায়, এমনকি ইডেনে পড়ার সময়ও আমি ছিলাম শুকনা আর তখন তো ওজন অনেক কম ছিল। তো ভাইয়াদের ক্যাম্পেইনে ব্লাড দেয়ার উপকারীতা, কেন ব্লাড দিতে হয়, নিতে হয়, সময়মত ব্লাড না পেলে রোগীর কত ক্ষতি হয়, কে কে দিতে পারে বিস্তারিত বেশ সুন্দর করে ব্যাখা করেছিল। আর এক একটা ভাইয়ার কি গর্ব, কেউ কেউ ৫/৬ বার ব্লাড দিয়েছেন। একজন খুব লম্বা, হ্যান্ডসাম ভাইয়া বলল, আমি ১৯ বার দিয়েছি, সেই নাকি টিম লিডার, সবাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

যাই হোক প্রথম দিন গ্রুপিং হল, ওজন মাপা হল সবার, আমারও। আর আমায় বলা হল আমি ব্লাড দিতে পারব না, আমার ওজন অনেক কম তাছাড়া আমার প্রেশারও খুব লো। আমি কত কাকুতিমিনতি করলাম, প্লিজ ভাইয়া নেন, আমার অনেক শখ। না কেউ রাজি না। ক্যাম্পেইনের পরের দিন যারা যারা ব্লাড দিতে চায় এবং দিতে পারবে।

শুনে অনেক মন খারাপ হল। সারা রাত ভাবলাম কি করা যায়! ব্লাড আমায় দিতেই হবে, যে ভাবেই হোক। কারণ এরা আবার কবে এই মফস্বল শহরে আসবে তার ঠিক নাই। অনেক চিন্তা করে পরের দিন ডাবল সোয়েটার পড়ে তার উপর মেজো ফুফুর বোরকা পড়লাম, জীবনের প্রথম আর শেষ বার, নেকাবও করলাম। তো যখন ব্লাড দিতে গেলাম, মনে প্রাণে চেয়েছিলাম সেই লম্বা, টিম লিডার ভাইয়ার সামনে যেন না পড়ি কারণ আগেরদিন সারাদিন এক সাথে কাজ করেছি। উনি যদি আমায় চিনে ফেলেন!

আমি খুব চাইছিলাম আমার ব্লাড দেয়ার সিরিয়াল যেন আগে আসে, যাতে আমি ব্লাড দিয়ে বোরকা ছেড়ে তাদের হেল্প করতে পারি। তো আমি এক কোনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার ব্লাড দেয়ার সময় আসতেই সেই ভাইয়াটা অন্য ভাইয়াকে সরিয়ে দিয়ে বলল আমি নিচ্ছি। আমি তো পুরোপরি নার্ভাস, যদি ধরা পড়ি! সবার কাছে আমি কত স্নেহের, কত আদরের, আদর্শবাদী, আর আমি কিনা মিথ্যুক হয়ে যাব তাঁদের কাছে! রীতিমত ঘামছিলাম, হাত পাঁ কাঁপছিল। তো ভাইয়াটা আমার হাত নিয়ে ব্লাড নিতে শুরু করল। আমি তো হাত দিয়ে চোখ পর্যন্ত ডেকে রেখেছিলাম।

ব্লাড দেয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাই। পাশেই আমার বেষ্ট ফ্রেন্ড দাঁড়য়েছিল, ও ধরে আমায় আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল, জুস খাওয়ালো। আমি তো পালাবার জন্য অস্থির। সেই ভাইয়াটা বলে উঠল, " মুক্তা জেদ ভাল কিন্তু এত্ত জেদ ভাল না। আমার কথা শুনলে না, এখন বুঝো মজা"।
আমি তো হতবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম, আমায় চিনল কিভাবে! সে আমার দিকে তাকিয়ে খুব গভীর কন্ঠে বলেছিল,"তোমার চোখ"।

পরে অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম। না, আর কোনদিন দেখা হয়নি আমাদের।

রক্তদাতাঃ Nahid Suhan অভিজ্ঞতাঃ ৪৮ (সূচিপত্র)

একসময় প্রায়ই টিভিতে দেখতাম মুমূর্ষু রোগীর রক্তের প্রয়োজন, তখন মনে হত আমি যদি রক্ত দিতে পারতাম। কিন্তু তখন রক্তের গ্রুপ জানা ছিলো না, আর বয়সও আমার হয়নি। আমার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ।
আমার মা অসুস্থ। কিডনি সমস্যা, ডায়ালাইসিস করার জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয়। মায়ের রক্তের গ্রুপ বি পজেটিভ (B+)। পরিবারে আমি একমাত্র ছেলে। এক ব্যাগ রক্ত পাওয়া যে কত কষ্টের তা আমি বুঝি। তখন থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম যত দিন এই আলোর পৃথিবীতে আছি, ততদিন রক্ত দিয়ে যাবো।

এক অফিসে চাকরির আবেদন করেছিলাম, আবেদন পত্রে রক্তের গ্রুপ দেওয়া ছিলো। সেখান থেকে এক মায়ের ছেলে আমার নাম্বার নিলো, সিলেটের কমলগন্জে তাদের বাড়ি। মায়ের টিউমারের অপারেশন করতে হবে, এক সাপ্তাহ হলো রক্ত খুজঁছে পাচ্ছে না। উনাদের সাথে কথা হলো, রক্ত দিতে গেলাম। জীবনের প্রথম রক্ত দিলাম। উনারা খুব খুশি হলেন। এক ব্যাগ রক্ত দিলে তেমন ক্ষতি হয় না, আর যা হয় তা কয়েকদিনে পূরণ হয়ে যায়, কিন্তু যে আশীর্বাদ ও ভালবাসা পাওয়া যায় তার জন্যে পৃথিবীতে বেচেঁ থাকা যায়।

আজও উনি আমার খোজঁ রাখেন, এমনকি তাদের পরিবারের একজন করে নিয়েছেন। তাদের চোখে খুশির অশ্রু দেখে, জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। আমার মায়ের জন্যে রক্ত দিয়ে ও রক্ত দানে যারা আমাকে সহায়তা করছেন তাদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো। আপনাদের কারো রক্তের প্রয়োজন হলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন,আমি বুঝি রক্ত কি! আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।
আপনার এক ব্যাগ রক্ত, কারো পৃথিবীতে বাচাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। আমার মায়ের জন্যে দোয়া করবেন, যেন মা বলে সবসময় ডাকতে পারি, মা ছাড়া পৃথিবীতে আপন কেউ নেই। সবাই ভালো থাকবেন।

রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Himel Maruf অভিজ্ঞতাঃ ৪৯ (সূচিপত্র)

০৭.০২.১৪ ইং তারিখ শুক্রবার আমি জীবনে প্রথমবার রক্ত দান করি । রোগীর দেশের বাড়ী দিনাজপুরে, তবে অনেকদিন ঢাকায় থাকেন । বয়স ৫০ এর মত । মগবাজারে কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ এ ভর্তিরত। উনার পায়ের একটা বড় ধরনের অপারেশন হয়েছে যার কারনে আমার আগে উনার আরো ৫ ব্যাগ রক্ত লেগেছে । আমার রক্তের গ্রুপ 'এ নেগেটিভ' । এর আগে ১০ টা হতে ৪ টা পর্যন্ত বসে থেকে রক্ত দিতে না পারায় মনটা খুব খারাপ হয়েছিল সেদিন । কারনটা ছিল, সব ডেলিভারীতে রক্তের প্রয়োজন হয় না । যাই হোক, সেদিন থেকেই মনের ভিতরে রক্ত দানের আগ্রহটা আরো বেড়ে যায় ।

আমার প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষা চলছিল, তাই শুক্রবার ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না । তাই কয়েক বার যোগাযোগ করে ব্যাপারটা ফাইনাল করা হয় । শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে আমি নাস্তা করে রেডি হই । তারপর ১০ টায় কল্যাণপুর থেকে মগবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেই । আমার ধারনা ছিল জুম্মার নামাজটা বাসায় এসে পড়তে পারব । কিন্তু হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক বন্ধ থাকায় ঝামেলায় পড়তে হয় । প্যাথলোজীতে ১১:৩০ টায় ব্লাড দিয়েও সব টেস্টের রির্পোট দেয় ২ টায় । মাঝে জুম্মার নামাজটা পড়ে আসি । সত্যি বলতে কি, এই সময়টা অনেক খারাপ লাগছিল । একে তো ভয়ে ছিলাম যে রির্পোটে কি আসে, রক্ত দিতে পারবো কিনা । তারপরও এতো দেরি । অবশেষে যখন জানতে পারলাম আমার রক্ত দিতে কোন সমস্যা নাই তখন একটু স্বস্তি পেলাম ।

আমার আগের একজন যখন রক্ত দিচ্ছিল তখন একটু একটু ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু রক্ত দেওয়ার সময় তেমন কিছু মনে হয়নি । সূচ এর সামন্য ব্যাথা কিছুই না । মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার এক ব্যাগ ব্লাড দিতে ০২ মিনিট ৫২ সেকেন্ড সময় লাগে । ডাক্তার এর মতে, আমার রক্তের চাপ নাকি বেশি । আমার আগের জনের ৪ মিনিট এর বেশি সময় লেগেছে । রক্ত দেওয়া শেষ হলে কিছু সময় শুয়ে থাকি । বাসায় চলে আসার আগে রোগীর কাছে যখন বিদায় নিতে গেলাম আর উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করছিলেন। সত্যিই সেটা ছিল আমার জন্য অনেক পাওয়া । কতোটা যে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিলাম তা লিখে প্রকাশ করার মত ভাষা আমার জানা নেই । যারা রক্ত দান করেছেন শুধুমাত্র তারাই বুঝেন । আমার মনে হয়, এই দোয়া মন থেকে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ভাবতেই ভাল লাগছে যে, মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের বিপদে সাহায্য করতে পেরেছি। তাই তো এখন আবার অপেক্ষার প্রহর গুনছি কবে আবার রক্ত দিতে পারবো আর মন থেকে তৃপ্তি পাব ।

"করে ফেলুন পুণ্যের কাম, রক্ত দিন জীবন বাঁচান"।

রক্তদাতাঃ ফাতেমা আক্তার পাখি অভিজ্ঞতাঃ ৫০ (সূচিপত্র)

আমি প্রথম রক্ত দেওয়ার আগে অনেক-অনেক ভয় পেয়েছিলাম। ভাবলাম রক্ত দিলে যদি আমার কোনো ক্ষতি হয়, জানিনা রক্ত নেওয়ার সময় কতোটা কষ্ট হতে পারে - এই রকম অনেক বাজে-বাজে চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, ভয় কাজ করছিল । কিন্তু আমার ফ্রেন্ড ফারুক হোসাইন সব সময় আমাকে অনেক অনেক উৎসাহ দিতে লাগলো।

আমি ভাবলাম যা হবার হবে, তাই গেলাম রক্তদান করতে, এবং রক্তদান করলাম। যে সকল ভয় আমার কাজ করেছিল তার ১% আমার ভিতর কাজ করল না । যখন রক্ত নিল ঠিক তখন বুঝতে পাড়লাম মিথ্যে ভয়গুলো আমার মনে কাজ করছিল। রক্ত দেওয়ার পর কি রকম ভালো লাগার অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করছিল সেটা বলে বুঝাতে পারবো না । তারপর থেকে ঠিক করলাম আমি নিয়মিত ব্লাড ডোনেট করবো। এবং অন্যকে রক্ত দানে উৎসাহীত করবো। তাই এই মানবসেবার কাজ করছি। জানিনা কতদিন করতে পারবো এই কাজ। তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

আমি যখন রক্ত দিতে গিয়েছিলাম, তখন কাউকে বলিনি। রক্ত দিয়ে আসার সময় প্রায় রাত হয়ে যায়, বাড়ীতে ফিরতেই সবাই প্রশ্ন করছে এত দেরি হল কেন। আমি চিন্তা করলাম রক্ত দেওয়ার কথা বললে যদি সবাই বকা দেয়, তাই কথাটা বললাম না । বললাম যে, আজকে ক্লাস শেষে কোচিং করে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার সাথে যাকে নিয়েছিলাম, সে বলে দিয়েছে যে আমি ব্লাড দিয়ে এসেছি। তখন সবাইকে আমাকে বকাবকি না করে, আমাকে অনেক বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমি মেনে নিতে পারলাম না। তাই এখন ফ্যামিলি চোখের আড়ালে এই কাজ করি । আমার এই মিথ্যে কথা বলার জন্য যদি একজন মানুষের প্রাণ বাঁচে তাহলে আমি এই রকম হাজারটা মিথ্যে কথা বলতে রাজি ।

রক্ত দিয়ে বাঁচাই

রক্তদাতাঃ মোঃ সামিউল হাসান হিমেল অভিজ্ঞতাঃ ৫১ (সূচিপত্র)

২০১২ সালের ৬ই আগস্ট। আমার এক বন্ধু রক্তদান করবে। মিরপুর ২ নাম্বার হার্ট ফাউন্ডেশনে তাঁর এক বড় ভাইয়ের আত্মীয়ের রক্ত লাগবে। আমাকেও সাথে করে নিয়ে যায় সে। রক্ত দেওয়ার সময় ওই বড় ভাইয়ের আপু আমাকে জিজ্ঞাসা করে,

- তোমার রক্ত গ্রুপ কি ?

আমি বললাম, এ+ ।

- তাহলে তুমিও রক্ত দাও । কিডনী অপারেশন অনেক রক্ত লাগবে।

আমি বললাম, আপু আমার তো ভয় লাগে ।

এরপর আমার বন্ধু, ওই ভাই আর আপু এই তিনজন মিলে আমাকে ধমক আর সাহস দিয়ে রক্ত নেওয়ার বেডে শুইয়ে দিলো । সূচ ঢোকানোর সময় ভয় ভয় লাগলেও পরে দেখলাম তেমন কোন ব্যাপারই না এইটা । যেই নার্স ছিলো উনি একটা বল দিয়ে পাঞ্চ করতে বললো । কিছুক্ষন পাঞ্চ করতে করতেই নাকি রক্ত নেওয়া শেষ । আমি তো মহাখুশি । সাথে আবার কত খাবারও খাওয়ালো ।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ MD Mamun Hussain অভিজ্ঞতাঃ ৫২ (সূচিপত্র)

২০০৬ কি ২০০৭ সালের কথা। একজন রোগী দেখতে গেলাম সিলেট মুজিব জাহান হাসপাতালে। হাসপাতালের দেয়ালে একটা পোস্টার ছিল এরকম, "আপনার ১৮ তম জন্মদিন পালন করুন স্বেচ্ছায় রক্ত দানের মাধ্যমে"। ঐ পোস্টারটাই ছিলো রক্তদানের মুল উৎসাহ কেন্দ্র। সেদিনই ঠিক করলাম ১৮ বছর হলে রক্ত দান করব।

১৮ বছর পূরন হওয়ার পূর্বে কয়েকজনকে বলে রাখলাম কারও রক্ত দরকার হলে যেন আমাকে জানায়। তখন এখনকার মত সবার সাথে পরিচয় না থাকায় সেটা সময় মত সম্ভব হয়নি। ১৮ বছর ৪ মাস বয়সে ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারি প্রথম রক্তদান করার সৌভাগ্য হয়। সেই থেকে আজ পযন্ত ১০ বার রক্তদানের সুযোগ হয়েছে আমার। তবে একটা আক্ষেপ, জন্মদিনে রক্তদান করা সম্ভব হল না এখনো। দোয়া করবেন এই ইচ্ছাটা যেন পূরন হয়।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Alif Afsana অভিজ্ঞতাঃ ৫৩ (সূচিপত্র)

আমি প্রথম রক্ত দিয়েছিলাম ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে। বৃদ্ধা এক মহিলা কে। চলে আসার সময় উনি আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। ভীষন অবাক হয়েছিলাম। সেই সাথে খুশিও। সত্যি বলতে এত ভাল আমার জীবনে কোনদিনও লাগে নি। পৃথিবীর সমস্ত ঐশর্য আর প্রাচুর্য ঐ জিনিসটার কাছে খুবই তুচ্ছ আর ক্ষুদ্র। এ এক অন্যরকম অর্জন।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Rasel Khan Niloy অভিজ্ঞতাঃ ৫৪(সূচিপত্র)

"সকলের তরে, সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" - এই কথাটা খুব ছোটকাল থেকেই অন্তরে লালন করতাম। বুঝ হবার পর থেকেই ভাবতাম, কখনো যদি কারো উপকার করতে পারতাম, তাহলে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করতে পারব। তাই ছোট থেকেই সামাজিক কাজকর্মের দিকে আমার একটু বেশিই নজর থাকত। আমি ছোট থেকেই দেখে আসছি আমার ছোট মামা সেচ্ছায় মূমুর্ষ রোগীকে রক্তদান করছে। মামা সেনাবাহিনীতে চাকরির করে,তাই মামা ডায়োড ঠিক রাখার জন্যই উপরের স্যারদের নির্দেশেই রক্তদান করত। প্রতিবার মামার বাসায় বেড়াতে গেলে মামার মুখ থেকে রক্তদানের গল্প শুনতাম। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলছি আমিও বড় হয়ে মানুষকে রক্ত দিবো।

আমার এইচ.এস.সি এক্সাম চলাকালে আমি একবার গোপনে ডাক্তারের কাছে যাই। রক্তদান এর কথা বলতেই ডাক্তার আমার শরীর এবং ওজন দেখে আমাকে দুই-এক বছর পর থেকে দিতে বলে। তখন অনেকটা মন খারাপ করেই চলে আসি। তারপর আমি চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত অবস্থায় দেখতাম ক্যাম্পাসে বড় ভাই এবং ফ্রেন্ডরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে রক্তদান করে আসে। পরে আমাদেরকে বলে এবং ফেসবুকে ছবিও আপলোড দেয়। একদিন আমি আর বন্ধু তানভীর একটি হাসপাতালে গিয়ে নিজেদের টাকা দিয়ে রক্তের গ্রুপ নির্নয় করে আসলাম শুধুই রক্তদান করবো বলে। গ্রুপ জানার পর তো আর তড় সইছে না কবে যে রক্তদান করবো। ক্যাম্পাসের ফ্রেন্ড, ছোট ভাই, শিক্ষকসহ মোটামুটি সবাইকে আমার রক্তের গ্রুপ জানিয়ে দিলাম।

কয়েকদিন পর আমার খুব প্রিয় একজন শিক্ষক কিবরিয়া স্যার বললেন, নিলয় ঢাকার পিজিতে এবি+ রক্ত লাগবে। নরসিংদী পলিটেকনিকের ইশরাত ম্যাডামের মায়ের ওপেন হার্ট সার্জারির অপারেশন।আমি স্যারকে একবাক্যে "হ্যা" বলে দিলাম। আমি চিন্তা করলাম,কাউকে সাহায্য করার জন্য আমার বাবার তো অনেক টাকা-পয়সা নাই, তাহলে এক ব্যাগ রক্ত দিয়েই মানুষকে সাহায্য করি। তারপর দুইদিন পর টিচারের সাথে চাঁদপুর থেকে দুপুরে রওনা দিয়ে ঢাকায় সন্ধ্যায় এসে পিজিতে ১ম বারের মতো ব্লাড ডোনেট করলাম। তখন আমি খুবই আনন্দিত এবং এক্সাইটেড ছিলাম।

উপলব্ধি টা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। রাতের লঞ্চেই আবার খুশি মন নিয়ে চাঁদপুর চলে আসলাম। এবং এখন নিয়মিত রক্তদান করি। ইনশাল্লাহ আমার রক্তদানে সেঞ্চুরি করার ইচ্ছে আছে।আপনারা দোয়া করবেন, যাতে ইচ্ছেটা পূরন করতে পারি। ১ম বার রক্ত দেওয়ার পর শুধু একটা কথাই বারবার একটা আফসোস করছি, -ইশ আরো আগে কেন রক্ত দেইনি!!

আমি রক্তদান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম নাহ।

২০১২ সালের এপ্রিল মাসের ১ম দিকের কথা। আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের দোকানে বসেছিলাম এমনিতে। হঠাৎ আমার স্যার এলেন দোকানে। স্যারকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল।

আমি স্যার কে বললাম, কিছু মনে না করলে আপনাকে একটা কথা বলতে পারি?
স্যার বললেন, আমি কিছু মনে করবো না। কি বলবি বল?
আমি বললাম, আপনাকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, কি নিয়ে চিন্তা করছেন? আমাকে বলুন।
স্যার বললেন, আমার ছেলে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। ওর জন্য প্রত্যেক মাসে রক্ত লাগে। আগামীকাল ১ব্যাগ রক্ত লাগবে চট্রগ্রাম আন্দরকিল্লা রেড ক্রিসেন্টে।
আমি তখন বললাম, কোন গ্রুপের রক্ত লাগবে?
স্যার বললেন, উনার ছেলের জন্য বি পজেটিভ রক্ত লাগবে।
আমি সাথে সাথে বললাম, আমার রক্তের গ্রুপ বি পজেটিভ, আমি আপনার ছেলেকে রক্ত দিব।
স্যার বললেন, তুই নিশ্চিত তোর ব্লাড গ্রুপ বি পজেটিভ যে?
আমি বললাম, আমাদের কলেজে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করছে সকল ছাত্রছাত্রীর, তখন আমার রক্তের গ্রুপ ও পরীক্ষা করেছি। উনারা বলছে আমার রক্তের গ্রুপ বি পজেটিভ।
এইবার স্যার বললেন, তোর বয়স এবং ওজন কত?
আমি বললাম, আমার বয়স ১৮+ এবং ওজন ৫২কেজি।
স্যার বললেন, তাহলে আগামীকাল সকালে আমার সাথে আন্দরকিল্লা রেড ক্রিসেন্টে যেতে পারবি, তোর কি কোন কাজ অথবা ক্লাস আছে কাল কলেজে।
আমি বললাম, আগামীকাল আমার যত কাজ থাকুক না কেন, সব কালকের জন্য বাদ এবং ক্লাস ও। আমি রক্ত দিমু দিমু দিমুই।

এরপরে লক্ষ্য করলাম, স্যার এর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

এর পরের দিন সকালে স্যারের সাথে মিরসরাই থেকে চট্রগ্রাম চলে গেলাম। তারপরে আন্দরকিল্লা রেড ক্রিসেন্টে আমি জীবনে ১ম রক্তদান করে ফেললাম। রক্তদান করার পর নিজের কাছে এতো যে খুশি লাগছে তা আর বলে বুঝাতে পারবো না। কিছুক্ষণ পরে স্যার বললেন, তুই তো সফল। তোর রক্তের সকল রকমের পরীক্ষা করা হয়েছে, কোন সমস্যা পাওয়া যায়নি। তোর রক্ত এখন আমার ছেলেকে দেওয়া হবে। এইটা শুনে আমিতো আরও মহা খুশি।

এরপরে স্যার কে বললাম,তাহলে তো আমি প্রত্যেক মাসে আপনার ছেলেকে রক্তদান করতে পারবো।
স্যার বললেন, না পারবি না।
আমি বললাম, কেন?

স্যার আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বললেন ৪মাস পর পর রক্তদান করতে পারবি।
আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে।

এরপরে স্যার থেকে বিদায় নিয়ে আমার এক কাজিনের বাসায় চলে গেলাম। বাসায় যাওয়ার পর একটু করে খারাপ লাগতে শুরু করল। তাই খেয়েদেয়ে একটা ঘুম দিলাম, ঘুম থেকে উঠার পর আগের মতো আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলাম।

২০১৪ সালের শেষের দিক থেকে স্বেচ্ছায় রক্তাদাতা ম্যানেজ করে দেয়ার কাজ করছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, যাতে আমি মানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি।

(হ্যাপি ব্লাড ডোনেটিং \bd/)

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ আদনান রাফিন অভিজ্ঞতাঃ ৫৬ (সূচিপত্র)

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম ব্লাড দিবো। এক বড় ভাইয়ার পরামর্শে ব্লাড দিতে আগ্রহী হয়েছিলাম।

১১ ফেব্রুয়ারি রাতে এক ছোট ভাই জানালো ওর এক বন্ধুর মায়ের জন্য এক ব্যাগ রক্ত লাগবে, আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম। সারাটা রাত উত্তেজিত হয়ে ছিলাম, একটু ভয় ভয়ও লাগছিল। সকালে উঠে নাস্তা করে রওয়ানা দিলাম ঢাকা মেডিকেলের উদ্দেশ্যে। গিয়ে ওই ছেলের বাবাকে ফোন দিয়ে তার সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে একদম নিজের ছেলের মত আদর করছিলেন। নাম কি, কোথায় পড়ি এসব জিজ্ঞেস করে এক বোতল পানি আর একটা আপেল এনে দিল। জোর করে আমাকে খাওয়ালো। কিছুক্ষন পর একটা রুমে নিয়ে গেল। ডাক্তার নাম ঠিকানা বয়স ওজন এগুলো জিজ্ঞেস করছিলেন। এরপর প্রথমবারের মত রক্তদান সম্পন্ন করে রুম থেকে বের হলাম। হালকা দূর্বল লাগছিল। আংকেল আমাকে সেভেন আপ, আরেকটা আপেল এনে দিলেন। আমি সময় নিয়ে ওগুলো খেলাম। তারপর আংকেল আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন, কিভাবে যাবো সব বলে দিলেন। অনেকবার ধন্যবাদ দিলো আমাকে। উনাকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছিল। আন্টির ক্যান্সার হয়েছিল।

যাই হোক আমি চলে আসলাম বাসায়।
অনেক অনেক বেশি ভালো লাগছিল। এরপর থেকে নিয়মিত ৪ মাস পরপর রক্ত দিয়ে আসছি।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

সালটা ছিল, ২০১২ তারিখটা মনে নেই।

বইতে পড়েছিলাম ১৮ বছর থেকে রক্ত দেয়া যায়। আর সেটাই বিশ্বাস করতাম তবে ওজন হতে হয় ৫০ কেজি, তবে আমি ছিলাম ৪৫-৪৬ কেজি। তবে বুকে ছিল অদম্য সাহস । সবার মাঝে একটা ভয় কাজ করে আর সেই ভয়টা আমি কখনোই পেতাম না। আমি সুঁইয়ের কথাই বলছি। এই ভয়টা আমার কখনোই ছিল না। ছোট বেলা থেকে নানা প্রকার টিকা আর বেকসিন নিতে নিতে এক প্রকার অভ্যস্থ হয়ে গেছি।

একদিন আমার এক পরিচিত দাদা একজন রোগীর জন্য B+ রক্ত খুঁজছিলেন। সেই ছোট বেলায় টেস্ট করেছিলাম তখন থেকেই জানতাম আমার রক্তের গ্রুপ B+ ।
আমি শুনে বলি, আমি দিব দাদা। তবে যাওয়ার জন্য মনে হয় ভাড়া ছিল না। দাদা বলে কোন সমস্যা নাই। আমি দিব।

যে রোগীর জন্য ব্লাড দিই তার মুখ দেখার সুযোগ হয়নি। ব্লাড দেয়ারর পর নাকি অনেকের মাথা ঘুড়ায়। কিন্তু আমার তেমন কিছুই হয়নি। দেয়ার পর পানি জুস কেক সবই খেলাম। তারপর বাসায় ফিরে এলাম। মনের মধ্যে একটা আনন্দ কাজ করছিল জীবনে কোন ভাল কাজ না করলেও আজ একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

আনন্দ ধরে না রেখতে পেরে মাকে বলি, মা, আজ না আমি একটা ভাল কাজ করছি।
মা বলে, কি?
- আজ এক বোনকে রক্ত দিয়েছি।

শুরু হয়ে যায় বকাঝকা গালাগালি। এক বার বলে, তুই আমার ঘর থেকে বের হয়ে যা।
আজ সে মা আমায় ব্লাড ম্যানেজ করতে অনুপ্রেরণা দেয়।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Muhammad Abu Shohel অভিজ্ঞতাঃ ৫৮ (সূচিপত্র)

সময়টা ২০১১ সাল, আমার বয়স তখন ১৯ বছর।প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অর্ধবর্ষের ছাত্র। আমি তখন নিজের ব্লাড গ্রুপ ও জানতাম না!

আমার দাদী ছিল উষ্ণমাত্রার ডায়াবেটিকস প্যাশেন্ট, তার উপর রক্তশুন্যতা। CSCR এ ভর্তি ছিলো। বেশ কয়েক ব্যাগ ও+ রক্তের প্রয়োজন। আত্মীয়-স্বজন'দের মধ্যে কয়েকজন রক্ত দিয়েছেন। আমার এক চাচা নিজের রক্তের গ্রুপ চেক করে দেখলেন তার এ+। তিনি খুব আপসেট হলেন, নিজের মা'কে রক্ত দিতে পারবেননা বলে।

তখন আমি রক্তের গ্রুপ জানতে আগ্রহী হলাম। সন্ধানীতে গিয়ে চেক করে দেখলাম আমারটা ও+! খুব খুশি হয়েছিলাম দাদীর সাথে মিলে গেছে বলে! দুইদিন পরে রক্ত লাগতে পারে। আমি বললাম, আমিই দিবো।

যাইহোক, প্রথমবার নিজের দাদীকেই রক্ত দিলাম।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদান বিষয়ে আগ্রহ ছিলো অনেক আগে থেকেই, কিন্তু কখনো সুযোগ হয়নি। পরবর্তীতে কুমিল্লার একটি সংগঠনের মেম্বার হই। ওখানেই সঞ্চারনের এবায়েদ রিয়াজ ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়। ওনাকে রক্তের গ্রুপ এবং রক্তদানে আমি যে আগ্রহী সেটা বললাম।

তো হঠাৎ একদিন এবায়েদ ভাই আমাকে ফোন করে বলল, তুমি রক্ত দিতে পারবে? আমি বলেছিলাম, কখন লাগবে এবং কোথায়? তখন তিনি বললেন, কিছুক্ষন পর কনফার্ম করছি।

কিছুক্ষন পরেই ফোনটা বেজে উঠল এবং সেটা ছিল রোগীর আত্মীয়ের ফোন। কথা বলার পর শিউর করলো যে সন্ধ্যার পরে ব্লাড দিতে হবে। আর সেদিনটা ছিল ২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫। একদিকে আমার জন্মদিন, অন্যদিকে আমার এইচ এস সি পরীক্ষা। আর আমি আর আমার বড় ভাই থাকতাম কুমিল্লায় এক ভাড়া বাসায়।

সন্ধ্যার সময় ব্লাড দেয়ার জন্য রওনা দিয়ে হাসপাতালে পৌছে জানতে পারলাম রাত ৮ টায় ব্লাড নিবে। তখন তো ভয়ে অবস্থা খারাপ, কারন এত রাত কোথায় ছিলাম ভাইয়া জানতে চাইলে কি বলবো!

যাক, টেনশন করতে করতে ব্লাড দেওয়ার সময় হয়ে গেল, সেখানে যাওয়ার পর নার্সের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ব্লাড দিয়ে বিদায় নিতে নিতে রাত ৯টা বেজে গেল। পরে হাসপাতাল থেকে নেমে এক দৌড়ে অটোস্ট্যান্ডে এসে অটোতে উঠলাম। অটো ছাড়ার কিছুক্ষন পর হঠাৎ অনুভব করলাম হাতটা ঝিমঝিম করছে।
যাক, সবকিছু বাদ দিয়ে বাসার গেইটের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি ভাইয়া বাসায় চলে এসেছে। দরজা নক করার পর খুলে ভাইয়ার প্রথম কথা ছিল, এতক্ষন কোথায় ছিলি? বললাম স্যারের বাসায় ছিলাম। রাতে খাবার যখন খাচ্ছি, তখন অনুভব করলাম আমার মাথা প্রচন্ড ঘুরাচ্ছে।

অবশেষে খাওয়া শেষে যখন ফ্রি হয়ে ঘুমুতে গেলাম, তখন একটা ফোন আসল।রিসিভ করার পর বুঝতে পারলাম যে রোগীর আত্মীয় ফোন দিয়েছে। তখন ওই প্রান্ত থেকে আওয়াজ আসছে, সৈকত ভাই আপনার কি অবস্থা? আপনি বাসায় গিয়ে পৌঁছেছেন? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ ভালো আর হ্যাঁ বাসায়।
তখন রোগীর অবস্থা জানতে চাওয়ার পর বলল যে অপারেশন সাকসেসফুল আর রোগী এখন বেডে। সব শেষে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে চিন্তা করছিলাম যে আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমার এই জন্মদিন্টা এভাবে কাটবে।

পরে যখন রোগীর আত্মীয়ের মুখে শুনলাম যে রোগীর অবস্থা আগের চেয়েও ভালো, তখন বুকটা গর্বে ভরে গেল। সেদিন থেকেই শুরু। আমি ছোট বেলা থেকেই ইঞ্জেকশন, সূচ খুবই ভয় পেতাম। কিন্তু যখন রোগীর আপনজনের মুখে আমার উপর তাঁদের আস্থা, ভরসা দেখি, তখন ভয়টা আমার শক্তিতে পরিণত হয়।

আমার রক্তদানের বিষয়টা বাসায় জানানোর পর প্রচুর বকা খেয়েছিলাম কিন্তু যখন রোগীর আপনজনের সেই কৃতজ্ঞ ভরা মুখটা ভেসে ওঠে, তখন বকাগুলো অটোমেটিক হজম হয়ে যায়। এখনও আমার প্রথম রক্তদানের মুহূর্তটি মনে পড়লে অদ্ভুত একটা অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

মূলকথা : আজ যখন পরিবারের সবাই জানতে পারলো তখন সবাই খুশি, বিশেষ করে আমার মা যিনি আজ আমার কাজের জন্য গর্ববোধ করে। এতেই আমার শান্তি, তৃপ্তি।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রাত তখন এগারটা। Lim ভাই এসে জিজ্ঞেস করলেন, তানজিল, তোমার ব্লাড গ্রুপ কি?
আমি বললাম, বি পজিটিভ ভাইয়া।
- কালকে ব্লাড দিতে পারবে?
- ভাইয়া, আগে কখনো দেই নাই।
- আরে কিচ্ছু হবে না। এক ছোট বাচ্চার পা ভেঙ্গেছে। কাল অপারেশন। তোমার নম্বর দিয়ে দিচ্ছি রোগীর আত্মীয়দের। সকালে ফোন দিবে তোমাকে। বেশি করে পানি খাবা।

তখন আমার বয়স ছিলো আঠার বছর পাঁচ মাস।

সকালে ফোন এলো চট্টগ্রাম মেডিক্যালে গেলাম, ব্লাড দিলাম। ভালোই লাগলো। যে বাচ্চার ব্লাড দিলাম ওর বাবার অফিসের বস গাড়ি করে বাসায় দিয়েই যাবে। উনাকে বললাম, আমার বাসা কাছ্ সমস্যা হবে না। উনি নাছোড়বান্দা। ড্রপ করেই আসবেন। উনার গাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। আর হ্যাঁ, আসার পথে প্রবর্তক নামিয়ে সিজলে নিয়ে গিয়ে এত খাবার অর্ডার করলেন যে দেখেই হাঁফিয়ে গেলাম। এক ঘন্টা যাবৎ জোর করে এসব আমারে খাওয়ালেন।

যাই হোক ব্লাড দিয়েই দিলাম, খুশিতে নাকি টায়ার্ড হয়ে রাতে মরা মানুষের মত ঘুমালাম। এরপর থেকে কেউ বলে নাই কালকে ব্লাড দিতে পারবে? রক্তদানের সময় হলেই নিজ দায়িত্বে রক্ত দিয়ে আসি।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদান ব্যাপারটার সাথে প্রথম পরিচয় সম্ভবত প্রাইমারিতে পড়ার সময়।

আমরা বাস করতাম চিনিকলের কলোনীতে। চিনিকলের এক বড়কর্তার ছেলে মণি ভাই পড়তেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তিনি সন্ধানীর সদস্য ছিলেন, তাই তাঁর মাধ্যমে যোগাযোগ করে রংপুর মেডিকেল কলেজ ইউনিট আমাদের কলোনীতে এলো রক্ত সংগ্রহে। মণি ভাই অনেক বলে ১০-১২ জনকে রাজী করাতে পেরেছিলেন কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন জিএম সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন – কে রক্ত দেবে না? কেন দেবেনা! ব্যস! স্বেচ্ছায় হোক আর বসের ইচ্ছায় হোক, রক্তদাতাদের লাইন দুশো মিটার লম্বা হয়ে গেল! সন্ধানীর বড়ভাইদের একজন মোটর সাইকেল নিয়ে ছুট দিলেন নতুন করে ব্লাড ব্যাগ নিয়ে আসতে, কারণ তাঁরা সম্ভাব্য রক্তদাতার তিনগুণ হিসেব করে ৪০টা ব্যাগ এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা রক্ত নিতে পারলেন প্রায় আড়াইশো ব্যাগ। এই আড়াইশো জনের মধ্যে একমাত্র ও নেগেটিভ রক্তদাতা আমার আম্মু!

সেদিন সন্ধানীর ভাইয়ারা আমাদের, মানে অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও রক্তের গ্রুপ করিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও ডান হাতের মধ্যমার আগায় একটা খোঁচা খেয়ে মিনিট খানেক পর জানতে পারলাম আমার ব্লাড গ্রুপ বি পজেটিভ। আম্মুর ও নেগেটিভ, আব্বুর এ পজেটিভ আর আমার বি পজেটিভ। হায় সর্বনাশ! আমার গ্রুপ তো বাবা মার সাথে মেলেনা! আমি কি তবে আব্বু আম্মু কাউকেই কোনোদিন রক্ত দিতে পারবো না? তাছাড়া, বি পজেটিভ নাকি গরুর রক্ত, সবচেয়ে সস্তা, প্রায় পানসে রক্ত! বন্ধুরা খেপাতে লাগলো – যা ব্যাটা, তোর রক্তের ধক নাই! রক্তের ধক থাকা না থাকা একটা নিতান্তই আজগুবি ব্যাপার কিন্তু সেই রাতে আমার ঘুম হলো না!
জীবনের প্রথম রক্ত দেয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সকালে ক্লাস করতে আমার ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি সিঁড়ির ঠিক পাশে ক্যাম্প করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। দুপুরে আমি ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে দেখি, তাদের চোখমুখ শুকনো! চার ঘন্টায় রক্ত পাওয়া গেছে মাত্র ৭ ব্যাগ! আমার কী জানি মনে হলো, আমি গিয়ে বসলাম তাদের সামনে। তারা আনন্দের সাথে স্ক্রিনিং করলো এবং ঘোষণা করলো, আমার ব্লাডগ্রুপ বি পজেটিভ নয়, ও পজেটিভ! আমার প্রথম যে কথাটি মনে হলো, তা হচ্ছে – আমার রক্তের তাহলে ধক আছে! শুধুমাত্র এই খুশিতেই এক ব্যাগ রক্ত দিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু আমি পেলাম ব্যাগের বদলে ব্যাগ। প্রতি রক্তদাতাকে তারা উপহার হিসেবে কালো রঙের একটা কাপড়ের ফাইল-ব্যাগ উপহার দিচ্ছেন, এক্স-ফাইল ব্যাগ নামে এই বস্তু একসময় দেশে ভাইরাসের মতো জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই ব্যাগ দেখে আমাদের নাটক পাড়ার এক বড় ভাই প্রবল আকৃষ্ট হলেন এবং রক্ত দিতে চলে এলেন।

রক্ত দিতে গিয়ে সবচেয়ে মধুর অভিজ্ঞতা দিনাজপুরে। আমি তখন দিনাজপুরের "আমাদের থিয়েটার" নামক দলটিতে কেবলই যাতায়াত শুরু করেছি, সেটা সম্ভবত দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের ঘটনা। সহ সভাপতি চানু দা'র একটা ছাত্রী মেস ছিল, সেখানকার এক বোর্ডার দুদিন আগে তার মা'কে ভর্তি করেছে শহরের একটা ক্লিনিকে, ভদ্রমহিলার লিভার বা ইউটেরাস কোথায় যেন অপারেশন করতে হবে। চানু দা থিয়েটারে এসে ও পজেটিভ গ্রুপের কেউ আছেন কিনা খোঁজ করতেই আমি হাত তুললাম। চানু দা খুবই সঙ্কুচিত, কেননা আমি গ্রুপে কেবল এসেছি, তাও আবার একটা থিয়েটার কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসেবে। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, রক্ত আমি দেবোই। চানু দা আমাকে নিয়ে গেলেন ক্লিনিকে। রক্ত দিচ্ছি, সেই সময় তিনি জানালেন, চিকিৎসা ব্যয়ের প্রায় অর্ধেকটা চানু দা নিজেই বহন করছেন, কেননা রোগীর আর্থিক সঙ্গতি প্রায় নেই। বোর্ডার মেয়েটার গত কয়েক মাসের ভাড়া বাকি। আমি রক্ত দেয়া শেষ করে, জ্যুস খেয়ে বেরোনোর আয়োজন করছি, এমন সময় সেই মেয়েটা এসে বললো, মামা, আম্মা আপনেরে ডাকে। আমি বললাম, তুমি না একটু আগে আমাকে দাদা ডাকছিলে, এখন মামা বলছো কেন? মেয়েটা বললো, আম্মা কইছে, আমার গায়ে যার রক্ত

সে আমার ভাই, আমার রক্তের ভাই! আমি অনেক কষ্টে গলার কাছে এসে আঁটকে থাকা আবেগটাকে দমন করে গেলাম আমার রক্তের বোনকে দেখতে। তিনি আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে ব্যাকূল হয়ে কাঁদতে থাকলেন, একটা কথাও বলতে পারলেন না। ... আমি জীবনে যতবার রক্ত দিতে গিয়েছি, ততোবারই কোনো না কোনোভাবে আমার সেই বোনটির চেহারা ফিরে ফিরে এসেছে আমার সামনে, কখনও রক্ত গ্রহিতার মাঝে, কখনওবা গ্রহিতার আত্মীয়দের কারও মধ্যে। আমি আসলে রক্ত দিতে যাই আমার সেই বোনটির সাথে আরও একবার দেখা করে আসার জন্যই।

পিজিতে এক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুকে রক্ত দিতে গিয়ে তার 'সাবেক সৈনিক' পিতার অসহায়ত্ব দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। কমান্ডো ট্রেনিংয়ের ভয়ে লোকটি বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল, অথচ বাহিনীতে থাকলে ছেলেটির চিকিৎসার সকল দায়িত্ব সেনাবাহিনীই গ্রহণ করতো! এই কথা যখন তিনি বলছিলেন, আমার কাছে মনে হলো আমি যেন ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার পথে এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর কনফেশান শুনছি!

একবার ইউনাইটেড হাসপাতালে রক্ত দিতে গিয়ে রিসিপশনে পৌঁছুতেই শুনি রোগী আর নেই! আরেকবার সেই ইউনাইটেডেই রক্ত দেয়ার জন্য স্ক্রিনিং করার পর ডাক্তার এসে বললেন, রক্ত লাগবে না। রোগী কাল সকালে ডিসচার্জ হয়ে যাবেন, তিনি সব শংকামুক্ত। বৃদ্ধা রোগীর নাতি আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন, যেন ডাক্তার নয়, আমিই তাঁর দাদীকে সুস্থ করে দিয়েছি! সেই ইউনাইটেডে শেষ পর্যন্ত রক্ত দিলাম, মডেল-অভিনেত্রী সুজানা জাফরের বাবাকে। তাঁকে রক্ত দিতে যাওয়ার পথে সিএনজি এক্সিডেন্ট করে নিজের নাক, ঠোঁট ও কপালে ৭টা সেলাই পর্যন্ত দিতে হয়েছিল দেড় সপ্তাহ আগে। সেলাই শুকোতেই আবার ছুটলাম রক্ত দিতে। কিন্তু সেই রক্ত তাঁর শরীরে একটা পূর্ণ চক্রে ঘুরে আসলো কিনা কে জানে, কারণ পরদিনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন!

সর্বশেষ রক্ত দিয়েছিলাম গত রমজানের শেষ সন্ধ্যায়, মানে চাঁনরাতে। শুভ ভাই কল করে জানালেন, গর্ভবতী এক আপুর গর্ভের সন্তান মারা গেছে, রক্তক্ষরণে রোগীর সঙ্গীন অবস্থা। দেরি করেন না ভাই। শেষ ইফতারটা কোনোরকমে শেষ করেই আমি ছুটলাম। স্ক্রিনিংয়ের জন্য স্যাম্পল জমা দিয়ে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ ফোন করলেন আম্মু। চাঁদ ওঠার খবর দিতে। আমি তাঁকে জানালাম যে, রক্ত দিতে এসেছি। আম্মু নাটকীয়ভাবে হাউমাউ কান্নাকাটি শুরু করলেন। আমি হতভম্ব। এই কান্নার মানে কী? আমি কি কচি খোকা যে, আমার রক্ত দেয়ার কথা শুনে মা কাঁদবেন? আম্মু কোনোরকমে কান্না থামিয়ে নিজের মনেই বলতে থাকলেন, আমার বেহেস্তবাসী আব্বুর উদ্দেশে - "খুশির চাঁদকে সাক্ষী রেখে তোমার ছেলে রক্ত দিতে গেছে, যাতে আল্লাহ্ তোমার উপর সদয় হন, তুমি কি টের পাচ্ছো?"

জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবো, যতবার রক্ত দিতে যাবো, এই বাক্যটা আমার কানে অমৃতের মতো বাজবে। আমরা প্রত্যেকেই যদি রক্তদানকে এমন একটি মহৎ উদ্দেশ্য হিসেবে পরিণত করতে পারি যে, আমাদের রক্তদানের প্রতিফলে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পিতামাতা, ভাইবোন, সন্তানদের প্রতি, পূর্বপুরুষদের প্রতি, নিকটজনদের প্রতি সদয় হবেন, তাহলে জগতে রক্তদানের চেয়ে উৎসাহব্যাঞ্জক কাজ মনে হয় আর একটাও থাকবে না।

আমি দিয়েছিলাম একটা ১৩ মাস বয়সী বাচ্চাকে। চিনি না , জানি না। আমি স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে মাত্র বের হলাম। একটা ভাই কল দিয়ে বলল রক্ত দিতে। তখন আমার বয়স ১৮ তে পা দিলাম মাত্র। রোগীর বাবা ট্রেনে ফেরী করে। এই বাচ্চাকেই প্রথম রক্তদান করি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বাবুটাকে আমি ৬ বার রক্ত দিয়েছি। ১৩ মাসের বাবু এখন আমাকে মামা বলে ডাকে। তখন খুব মায়া লাগে। ৪ বছর চলতেছে। এখনো বাবুকে ব্লাড দিতে হয়। আমি আমার কিছু বন্ধুর নাম্বার দিয়েছি। দরকার হলেই যেন তাদেরকে জানায়। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি ৮ বার রক্ত দিয়েছি। কিন্তু ১ম বার দেয়ার অনুভুতি কখনোই ভুলার নয়।

(আম্মা-আব্বার সেই রকম বকা শুনেছি যদিও)

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

প্রথম রক্ত দানের অভিজ্ঞতা দারুণ ছিল। যাকে রক্ত দিয়েছিলাম তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বড় ভাই। কিডনিজনিত কোন এক সমস্যার কারনে অপারেশন করতে হয়েছিল উনার।

এটা ২০১৩ সালের ঘটনা। এখনো মনে পড়ে বুকের মধ্যে দূর দূর করছিলো ! শুধু ভাবছিলাম সুই যখন ফোটাবে তখন কেমন লাগবে! যখন বেড়ে শুলাম তখন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এমন অবস্থা। জাস্ট একটা পিপড়া কামড়ালে যেমন তার থেকে একটু বেশী চিনচিনে একটা অনুভূতি, তারপর আর কিছু হয়নি।

সেই ঘটনা মনে পরলে এখনো হাসি পায়। কত ভয় পেয়েছিলাম! কিন্তু বাস্তবে এটা কোন ঘটনাই না।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

প্রথম রক্ত দিতে গিয়েছিলাম ২০১০ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে। কুমিল্লা ট্রমা সেন্টারে ছিল বাইক এক্সিডেন্টের পেশেন্ট। রাত ১টায় কলেজ থেকে ১.৫ কিলো হেঁটে বিশ্বরোড আসি, তারপর টেম্প করে হাসপাতালে।প্রথম রক্তদান করলাম এই রোগীকে।

সুচের ভয় লাগে নাই, কারন বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রাক্টিক্যালে দিয়েছিলাম সিরিঞ্জ দিয়ে দুইবার।

আমার ভাগ্য! জীবনে আমার প্রথম রক্তদান ছিল বাইক এক্সিডেন্টের পেশেন্টকে, আর ঐ বাইক এক্সিডেন্টেই আমার ১৬ ব্যাগ ব্লাড নিতে বাধ্য করেছে।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Fahim Rubby অভিজ্ঞতাঃ ৬৫ (সূচিপত্র)

প্রথমবার রক্ত দেই আমার বাবাকে। জরুরি মুহূর্তে রক্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন আমি সবে কলেজে পড়ি। সাহস করে দিয়ে ফেললাম রক্ত। আমাদের পরিবারে আমার আর আব্বুর রক্তের গ্রুপ একই, বাকিদেরটা আলাদা।

রক্ত দেয়ার পর আত্মীয়স্বজন এর ভালোবাসার অত্যাচার চললো দুই দিন ধরে। এটা খাও, ওটা খাও, ঘুমাও, রেস্ট নাও! তারপর থেকে নিয়মিত রক্ত দেই।

একবার রাত দেড়টায় বারডেম এ রক্ত দিতে হবে,আব্বু নিজে গাড়ি করে পৌঁছে দিলো।এসব অভিজ্ঞতা ভুলে যাবার মতন না।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Tetu Deb অভিজ্ঞতাঃ ৬৬ (সূচিপত্র)

আমি ১ম রক্তদান করি ৩০শে মার্চ ২০১৪। এ পর্যন্ত ৫ বার রক্তদান করেছি।

রক্তদান সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণা ছিল না। ফেসবুকে কিছু পোস্ট পড়ে আমি রক্তদান সম্পর্কে অবগত হই। পরে শুভ ভাইয়ের সাথে ফ্রেন্ডশীপ হওয়ার পর রক্তদানের প্রতি আগ্রহী হই। এবং রক্তদান করি। আমি আগে যে বাসায় থাকতাম, সে বাসার ৩য় তলায় একজন মহিলা থাকতেন। উনার বাবা ছিলেন ক্যান্সারের রোগী। রক্ত দেয়ার আগে একটু ভয় ভয় লাগছিল। ক্রস মেচিং এর সময় একটু চিন্তিত ছিলাম। আমার শুধু মনে হচ্ছিল আমার বড় কোন রোগ আছে। পরে কোন সমস্যা হয়নি। ঐ বাবাকেই ১ম রক্তদান করি।

ঐ মহিলা আমার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এখনো দেখা হলে, আমার খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা করেন। তবে উনার বাবা যেহেতু ক্যান্সারের রোগী ছিলেন, তাই এর কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। এটা শুনে খুব খারাপ লাগছিল আমার।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Md Nazmus Sakib অভিজ্ঞতাঃ ৬৭ (সূচিপত্র)

আমাদের স্কুলে একটা প্রোগ্রামে রক্তদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছিল। তখন থেকেই ১৮ বছর হবার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। যখন হলাম, একদিন দেখি এলাকার স্কুলে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এসেছে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী নিয়ে। গেলাম, রক্ত দান করলাম। সামুদ্রিক শৈবালের তৈরী সবুজ রঙের কি যেন এক শরবতও খেলাম।

খুব ভয়ে ছিলাম রক্ত দেয়ার পর না জানি কেমন দুর্বল লাগে! মাথা ঘুরে পড়ে যাব কিনা! কিন্তু আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত অনেকবার রক্ত দিয়েছি, কখনোই কোন সমস্যায় পড়িনি! সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত রক্তদান করে যেতে চাই।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

অভিজ্ঞতা ভালো না। ১০ দিনের এক ছোট্ট বাচ্চার টিউমার হওয়ার কারনে তার মা তাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে চলে যায়। হাসপাতালের ডাক্তাররা তখন বিনা খরচে অপারেশন করে। অপারেশনের সময় রক্তের প্রয়োজন ছিল। অসহায় এই বাচ্চাকে রক্তদান করি কারন কেউ ছিল না বাচ্চাটার তাই। অপারেশন সফলও হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র অপারেশন পরবর্তী সঠিক যত্নের অভাবে বাচ্চাটা মারা যায় ১ মাস পরে।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Lima Kabir অভিজ্ঞতাঃ ৬৯ (সূচিপত্র)

মাঝ রাতে ঘুম থেকে তুলে জামাই ধরে নিয়ে গেছে রক্ত দিতে। রক্ত দিয়ে রোগীকে দেখতে এসে হাসপাতালের করিডোরে ধ-পা-স! প্রথম রক্তদানের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ছিল।

রোগীর অবস্থা সিরিয়াস ছিল। আর মাঝ রাত বলে এক গ্লাস পানিও খাওয়া হয়নি। তার উপর প্রায় অনেক খানি দৌড়ে রুগীর কাছে এসেছিলাম। তখনি বুঝতে পেরেছিলাম, এই ধপাস হলাম বলে।

যাও জ্ঞান ফিরে আসার পথে, তখন কানের কাছে জামাই এর ঘ্যানর ঘ্যানর। চোখ খুলে রাখ, চোখ খুলে রাখ, পানি খাও ব্লা ব্লা। শব্দ গুলো এত কানে লাগছিল! যতই হাত দিয়ে ইশারা করি চুপ কর। কিসের কি? ভাঙা রেকর্ড বেজেই যাচ্ছে।

উফ!! অভিজ্ঞতা খালি ভয়াবহ না। চরম বিরক্তিকর ছিল এই অংশটা। তবে একজন রোগীকে সাহায্য করতে পেরেছি, সেই তৃপ্তিও ছিল।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Selina Kadir Babli অভিজ্ঞতাঃ ৭০ (সূচিপত্র)

রক্ত দেবার কথা সত্যিই বলতে কলেজ পর্যন্ত চিন্তা করি নাই। কি করবো? সুই বলে যত সব ভয় আমার!

ভার্সিটিতে ওঠার পর আশেপাশের দুই-এক ফ্রেন্ডকে দেখলাম কত অসাধারণভাবে ব্লাড ডোনেট করে যাচ্ছে। সাকিব দারুনভাবে আমাকে অনুপ্রানিত করলো। যার ফলাফল হিসেবে গত ২০১৪ সালের ২৫শে জুলাই নাম লিখিয়ে ফেললাম ব্লাড ডোনারদের খাতায়।

যতদিন সামর্থ্য আছে ব্লাড দিয়ে যাবো ইনশা আল্লাহ।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তের দরকার ছিল আমার বন্ধুর ভাইয়ের জন্য। প্রথম রক্ত দিতে যেয়ে শুনি রক্ত ম্যানেজ হয়ে গেছে। রক্ত দেয়া লাগবে না।আমি তো খুব খুশি।

এর পর প্রায় এক বছর কেউ আর রক্ত চায়নি। তাই আমারও সুযোগ আসেনি।কিন্তু ফেসবুকে এসে অনেকের সাথে পরিচয় হল। এরপর রক্তদান নিয়ে আমার আগ্রহ বাড়ে। এবং একদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে আসি। আমি এখন পর্যন্ত ৪ বার রক্তদান করেছি। আমার রক্তের গ্রুপ এ পজেটিভ। এখন যতটা পারি চেস্টা করি রক্তের ব্যবস্থা করে দেয়ার ও সবাইকে রক্তদানে উৎসাহিত করার।

প্রথম রক্তদানের তারিখ মনে নেই।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Fahmida Ahmed Mou অভিজ্ঞতাঃ ৭২ (সূচিপত্র)

আমি যখন প্রথম রক্তদান সম্পর্কে অল্পসল্প শুনছি তখন সিটি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি। তখনই এক ফ্রেন্ডকে রক্ত দিতে দেখে ধরলাম "দোস্ত রক্তদিবো আমিও!" । তখন রক্তদান সম্পর্কিত কিছুই জানতাম না। ফ্রেন্ড বললো তোর বয়স হয়নাই, সময়ও হয়নাই। যখন হবে আমি তোরে জানাবো। এরপর রক্তদান সম্পর্কিত টুকটাক তথ্য জানলাম ওর কাছ থেকে। এরপর থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম ওর ফোনের কবে ডাক দিবে!

ইন্টার ফাইনাল দিয়ে এডিমিশন কোচিং। মেডিকেল কোচিং করতে যেয়ে আরো একটু বিস্তারিত জানলাম। এরপর থেকেই ওরে ফোর্স করি "আমার ১৮বছর হয়ে গেছে। এবার ম্যানেজ কর"। একদিন রাতে কল দিয়ে বললো কাল সকালে রামেকে চলে আয়। আমিতো মহাখুশি! বাসার সবাইকে ঘোষণা দিয়ে জানালাম যেনো যুদ্ধ জয়ে যাচ্ছি! এরপর একেকজনের রিএকশন ছিলো একেকরকম এবং আলটিমেটলি আমার রক্তদেয়া হলোনা সেবার! ডাক্তার, নার্স হয়েও বাসায় রক্ত দিতে এইভাবে নিরুৎসাহিত করায় ভীষণ আপসেট হয়ে গেছিলাম।

এরপর আরেকদিন কল এলো রক্ত দেবার জন্য। ২০১১সালের ৩১শে ডিসেম্বর। সেদিন আর কাউকে জানালাম না কোচিং এর স্পেশাল ক্লাসের নাম করে বেরিয়ে গেলাম। আগে কিছুই মনে হয়নি কিন্তু রক্তদানের রুমে ঢুকেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিলো! মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে রাখছি! সুঁইটা দেখে উঠে দৌড় দেবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করছি! জীবনে একটা ইঞ্জেকশন পর্যন্ত দেইনাই সজ্ঞানে আর এতবড় সুঁই! দাঁতে দাঁত চেপে থাকলাম, সাহসী হিসাবে নাইলে যদি আবার রক্ত না নেয় এই ভয়ে। কিন্তু পারলাম না। ভীষণ একটা চিক্কুর দিলাম আশেপাশে সবাই হেসে উঠেছিলো!

অবাক হয়ে ব্যাগের ভেতর ঢুকে যাওয়া রক্ত দেখছিলাম! আর বুঝতে চেষ্টা করছিলাম শরীরে রক্ত কমায় কিছু ফিল করছি কি না! কিচ্ছু না! এরপর রক্তদেয়ায় জুস পাইসিলাম ব্লাড দিয়ে সারাদিন টইটই করে ঘুরে পরে বাসায় ফিরছি!

সন্ধ্যার পরই ঠাটিয়ে জ্বর এলো! কাউরে বলতে পারিনাই কারণ কি! হাত ফুলে ঢোল হয়ে গেছিলো ওড়নার নিচে লুকিয়ে রেখেছি বাসায় অবস্থানকালীন! তবে মজার ব্যাপার কোনো টেনশানই হয়নি এ নিয়ে। সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কারণ মানুষকে সাহায্য করেছি এই বিশ্বাসে ছিলাম। দুদিনের মাথায় আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে গেলো।

রক্তদাতাঃ Riyad Zubair অভিজ্ঞতাঃ ৭৩ (সূচিপত্র)

১৯ তম বছরের শুরুর দিকে একজন থ্যালাসেমিয়া রোগীর বাচ্চাকে রক্ত দেবার সুযোগ হল। ভয় যে করেনি তা নয়। কিন্তু শিশুটার দিকে একবার তাকাতেই আমার সব ভয় কোথায় পালাল বুঝতেই পারলাম না। শিশুর মা যখন আমাকে ধরে বলল, বাবা, আমার ছেলেটা খুব স্কুলে যেতে চায় কিন্তু অসুখের জন্যে আর পারে না। আমার ছেলেটা বলে আমারই কেন এমন রোগ হল মা?

তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব ভাল না। ফলে ছেলের জন্য তিনি ঠিক রক্তের ব্যবস্থাও করতে পারেন না (তখনি মাসে ৩-৪ ব্যাগ রক্ত লাগত)। বাচ্চার মা প্রত্যেক মাসেই রক্ত দেন এই জন্য। শুনে নিজের কাছে বড়ই খারাপ লাগল। প্রথম বার রক্ত দিয়ে ফেললাম। দেখা গেল এটা তো কোন ঝামেলাই না, কোন ব্যাথাও না। বরং রক্ত দানের পর একটা মানসিক প্রশান্তি, সাথে বাচ্চার মায়ের দোয়া।

পরবর্তীতে আমরা কয়েক জন মিলে প্রতি চার মাস অন্তর বাচ্চাটিকে রক্ত দিয়েছি। আমি চার বার রক্ত দেবার পর একদিন জানতে পারলাম বাচ্চাটা এ দুনিয়ার সকল মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে।

আমরা যারা সুস্থ হয়ত কখনই এ কষ্ট গুলা একজন অসুস্থ মানুষের মত করে অনুভব করতে পারব না। আমি সুস্থ্য ভাবে জন্ম নিয়েছি বা সুস্থ্য আছি। এটা কি আমার নিজের অর্জিত গুন নাকি যে অধিকার নিয়েই জন্মেছি, যে অধিকার একটা অসুস্থ্য মানুষের নেই!

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

সেদিন আমার এক বন্ধু ফোন করে জানালো খুব ছোট্ট একটা বাচ্চার (১০ দিন বয়স মাত্র) জন্য রক্ত লাগবে(মাত্র ১ সিরিঞ্জ)। আমি ভাবলাম যেহেতু মাত্র ১ সিরিঞ্জ সেটা তো আমিই দিতে পারি। অনেক বারই ব্লাড ডোনেট করবো করবো করে ভয়ে করা হয়নি। তাই পরিক্ষামুলক ভাবে চাইলাম ছোট থেকেই শুরু করি। অবস্থা ভাল দেখলে নিয়মিত হবো। পরে হসপিটালে (পি.জি.) গেলাম।

রক্ত নেয়ার আগের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো। রোগীর আত্মীয় বলল ছোট ব্যাগে রক্ত নিবে। যেহেতু প্রথমবার তাই রক্তের পরিমাণ কম হলেও আমার কেমন জানি খুব ভয় লাগছিল। বন্ধুকে বললাম, মামা তুই আমার কাছে কাছেই থাকিস। একটু পরে আমাকে বিছানায় শোয়ানো হল। দেখলাম যেই লোকটি রক্ত নেয়ার কাজ করছেন উনি বড় একটা ব্যাগ বের করলেন। আমার কলিজার পানি দেখি শুকিয়ে যায় অবস্থা। বন্ধুকে বললাম, কিরে বড় ব্যাগ বের করে ক্যান। পরে বন্ধু ঐ লোকের সাথে কথা বলে আমাকে জানালো আমার কাছ থেকে নাকি পুরো ব্যাগ রক্ত নিবে (প্লাটিলেট না কি যেন হবে তাই)। আমার তখন কি অবস্থা সেটা মনে হয় না বললেও চলবে।

পরে রক্ত নেয়া শেষ হলো। কিন্তু আমার শরীরে তেমন কোন খারাপ লাগার মতো কিছু মনে হয়নি (শুধু ব্লাড নেয়ার সময় হাতটা একটু অবস মনে হচ্ছিলো কিন্তু সিরিয়াস কিছু না)। এখন মনের মধ্যে আবার আরেক ভয় ঢুকছে। আমি পুরোপুরি ফিট থাকলেও আমার কাছে মনে হচ্ছিলো কিছুক্ষণ পর মনে হয় খারাপ লাগবে, কিছুক্ষণ পর মনে হয় আমার একটা অঘটন ঘটবে (সেই কিছুক্ষণ আর আসেনি)।

কিন্তু এর মধ্যেই আমার ভেতর প্রচন্ড একটা ভাল লাগার অনুভূতি কাজ করছিলো। সেটা প্রথম প্রেমের অনুভূতির চেয়ে কোন অংশেই কম না। কেমন যেন একটা জয়ের অনুভূতি কাজ করছিল। আমার কেমন জানি বিশ্বাস হচ্ছিল না, কারন হচ্ছে শারিরীকভাবে আমার একটুও খারাপ লাগছিল না। আবার দেখি এক লোক ব্লাড দিয়াই দৌড়ের উপর (ভাবটা এমন যে জরুরি কোন মিটিং তারে ছাড়াই শেষ হইয়া যাইতাছে আর এইমাত্র যে ব্লাড দিলো এইটা তার কাছে ডাইল-ভাত)। এইটা দেখে ভয়টাও কেটে গেল।

আমার জীবনের প্রথম রক্তদান বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারেনি।

রক্তদাতাঃ Md. Yasin Sheikh অভিজ্ঞতাঃ ৭৫ (সূচিপত্র)

প্রথম মিশনঃ সুঁই Vs আমি

সময় ০৫/০৩/২০০। আমি ঢাকা থেকে একদিনের ছুটিতে বাড়ি আসি, খুলনায়।

সকাল ১০ টায় আমাদের দোকানে পরিচিত এক চাচা মন খারাপ করে বসেছিল। তার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম তার মেয়ে হাসপাতালে। রক্ত লাগবে। অনেক খোজাখুজি করেছে কিন্তু কোথাও রক্ত পায়নি। রক্ত না দিতে পারলে তার মেয়ে বাঁচবে না। তাঁর কান্না থামাতে পারছি না। এবার আমি চিন্তা করছি রক্ত দিলে কি হয় জানি না কিন্তু সুই বাবারে ভয় পাই। একটা মানুষ রক্তের অভাবে মারা যাবে আমি মানি না। চাচাকে বললাম আমি রক্ত দেবো।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে গেলাম। ব্লাড ব্যাংকে ঢুকে এবার আমার কেমন যেন লাগছে। কিন্তু সুই বাবা এলো, রক্ত নিয়ে চলে গেল। টের পাইনি কিছু।

"সুইয়ের ভয়, করেছি জয়"

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Bibhu Bikol অভিজ্ঞতাঃ ৭৬ (সূচিপত্র)

অনেক আগে আমাদের এলাকায় একটা সংগঠনে গিয়ে ব্লাড গ্রুপ চেক করলাম আর আমার ফোন নাম্বার দিলাম। অনেক আশায় ছিলাম কিন্তু একটা দিনও কোন ফোন পাইনি । তাই বলে কি আমি রক্ত দিব না!!

হুট করে একদিন একটা অফার পেলাম, কারখনায় দুর্ঘটনার একটা রোগীর জন্য B+ রক্ত লাগবে (এটা আমার কাছে একটা অফারের মত লেগেছিল, কারন অনেকদিন রক্ত দিতে চেয়েও পারি নি)। আর দেরি করলাম না। যদিও দূরে ছিলাম, তবুও ছুটে গেলাম আমি আর আমার বন্ধু টুটুল। ফোন টা ওকেই করা হয়েছিল। দুজন গেলাম আর দুজন দুই ব্যাগ রক্ত দিলাম। দেয়ার আগে একটু ভয় কাজ করলেও পরে অন্য রকম একটা আনন্দ কাজ করতে লাগল । আর দেখলাম এখানে প্রতিদিন অনেক মানুষের রক্তের প্রয়োজন হয় যা তারা ম্যানেজ করতে পারে না। তারপর বন্ধুদের নিয়ে 'Blood for Bogra' গঠন করলাম আমরা । এখন আমরা প্রতিমাসে অন্তত আমাদের বন্ধুদের মধ্য থেকে কিছু রক্ত হলেও ব্যবস্থা কারার চেষ্টা করি।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

প্রথম প্রথম 'আমি রক্ত দিব, আমি রক্ত দিব' বলে চিৎকার করতাম, কিন্তু মনে মনে একটা অজানা আতংক ছিল। কিন্তু একদিন সাহস নিয়ে গেলাম রক্ত দিতে। প্রথম রক্ত দিয়েছি দুপুরে, কিন্তু তার জন্য মনোবল যোগার করছিলাম সেই ভোর রাত হতে। তারপর সেই মনোবলের জোরে রক্ত দিলাম। কিন্তু মাথা ঘুরানো কিংবা অসুস্থতা বোধ, এমনটা কিছু হয়নি। উল্টো রক্ত দিয়ে, আনন্দ নিয়ে কর্ণফুলী সেতুতে ঘুরতে গিয়েছিলাম আমরা দুই বন্ধু মিলে, মাথার উপর কড়া রোদ নিয়ে। বুঝতে হবে কি পরিমান মনোবল আমার মধ্যে ছিল!

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Muhammad Jasim HQ অভিজ্ঞতাঃ ৭৮ (সূচিপত্র)

একজন পাথর শ্রমিককে রক্ত দিয়েছিলাম।পাথর ভাঙ্গার/তোলার মেশিনে লেগে তার পেটের ভিতরের অংশ বেরিয়ে এসেছিল!

রক্ত দেয়ার দুর্বলবোধ করা - এটা সম্পূর্ন মানসিক। আমি একবারও এটা অনুভব করিনি।
ভয় পেয়ে গেলেই বমি হয় বা মাথা ঘুরে বলে আমার ধারনা।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

১৯৯৬ কিংবা ৯৭ সাল, ঠিক মনে নাই।
বন্ধু /বড়-ভাই আমার রক্তের গ্রুপ জানতে চাইলেন। বললাম, B+। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় একটু অস্বস্থি লাগছিল। কিন্তু আগ্রহের কাছে সেটা কিছু না। ক্লিনিকে গেলাম। মনে দুরু দুরু অবস্থা।

পিপড়ার কামড়ের এর মতন একটা অনুভুতি। ৫ মিনিট এ কাজ শেষ, ২ মিনিট রেস্ট, ৫০০ মি.লি. পানি, তারপর ২ কিলোমিটার হাটা ইত্যাদি।

তখন থেকে আমি সুযোগ পেলে রক্ত দেই, আর মনে মনে ভাবি, আল্লাহ সবসময় সবাইকে অন্যের উপকার করার সুযোগ দেন না, তাই সুযোগ পেলে অবহেলা করা উচিত না।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

- হ্যালো কাজী ভাই বলছেন?
- স্বী বলুন। আপনি কে বলছেন?
- ভাইয়া আপনি সকালে আমার এক বন্ধুকে ফোন করে বি পজিটিভ ব্লাড ডোনেট করতে চান জানিয়েছিলেন।আমার এখন জরুরী ভিত্তিতে বি পজিটিভ ব্লাড লাগছে।আপনি কি এখন ব্লাড দিতে পারবেন?
- ঠিক আছে ভাইয়া আমি আপনাকে দশ মিনিট পর ফোন করে জানাচ্ছি আমি রক্ত দিতে আসছি কিনা।
-উনি ঠিক আছে

আমি তখন বন্ধুদের সাথে দই খাওয়া শেষ করে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলাম।
দশ মিনিট সময় নিলাম কারন তখন রাত বাজে এগারটা ছুঁই ছুঁই।

আমি নিজে থেকেই তাদের সাথে যোগাযোগ করে ব্লাড ডোনেট করার ব্যাপারটা নিশ্চিত করি এবং যেকোন প্রয়োজনে আমাকে ফোন করে জানাতে বলি। আমার একটি ছোট্ট প্রয়াসে যদি কারও মুখে হাঁসি ফোটে এটাইবা কম কিসের। পরক্ষনে চিন্তা করলাম আমার আসলেই যাওয়া উচিত ব্লাড দিতে। যেটা আমার অনেকদিনের একটা সৎ ইচ্ছা, আজ আর সে সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

পকেটে পর্যাপ্ত টাকা ছিল না, রাফি থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে আমি আর কানন রেড ক্রিসেন্ট যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ঠিক করলাম।
রাস্তায় যেতে যেতে কিছু ভাল ও কিছু খারাপ চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।জীবনে প্রথমবার ব্লাড ডোনেট করতে যাচ্ছি আমার ব্লাড সেলে যদি সমস্যা থাকে তাহলে আমি তো ব্লাড ডোনেট করতে পারব না। আবার মনের মাঝে দৃঢ় মনোবল ছিল যে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাকে আশাহত করবে না।

আমি আর একটু পর ব্লাড ডোনেট করব ভাবতেই আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। পাশাপাশি কানন আমাকে পুরোটা রাস্তা মেন্টালি খুব সাপোর্ট দিয়ে গেছে।

চিন্তায় চিন্তায় কখন যে আমরা পৌছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে টেরই পেলাম না।
ট্যাক্সি থেকে নামতেই যার ব্লাড প্রয়োজন সে আত্নীয় চিন্তিত ব্যাক্তিটিকে খুঁজে বের করতে কোন বেগ পেতে হল না।

-ভাইয়া আপনিই কি আমাকে ব্লাডের জন্য ফোন করেছেন?
-আপনি কাজী ভাই? স্বী আমিই ফোন করেছিলাম।
আমি বললাম, চলুন হাসপাতালের ভেতরে যাওয়া যাক।

তখন পর্যন্ত আমি জানিনা আমি কাকে ব্লাড ডোনেট করতে যাচ্ছি। করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাইয়াটার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম আমি যাকে ব্লাড ডোনেট করছি সে উনার তের বছরের ভাগ্নে,যার থ্যালাসেমিয়া রোগ ধরা পড়েছে। শুনে খানিকটা খারাপ লাগছিল আবার এই ভেবে ভালও লাগছিল যে আমি

বাচ্চাটাকে ব্লাড ডোনেট করে সাহায্য করতে যাচ্ছি।
কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর ব্লাড সংগ্রহ করার জন্য আমাকে একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমবার তাই অজানা এক ভয় কাজ করছিল সময় তখন প্রায় সাড়ে বারটা।
দেখলাম আমার পাশের বেডে আরও দু একজন মানুষ তারাও ব্লাড ডোনেট করছে। তাদেরকে দেখে মনে আরও বেশী সাহস সঞ্চিত হল।
আমাকে যখন বেডে শোয়ানো হল কানন পাশে থেকে আমাকে সাহস জোগাচ্ছিল।
বামহাতে সুঁই দিয়ে কখন যে ব্লাড সংগ্রহ হয়ে গেল,কাননের সাথে কথা বলতে বলতে টেরই পেলাম না।
ব্লাড দেয়ার পর শরীরে একটা হালকা অনুভূতি কাজ করছে।ততক্ষনে ভয় কাটিয়ে আমি আর কানন হাঁসিমুখে ডাবের পানি পান করছি।

আমি চিন্তা করছি আমি আজ এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক স্হাপন করলাম ছোট্ট বাচ্চাটার সাথে যাকে আমি কখনো চিনতামই না। ছোট্ট বাচ্চাটির শরীরে যখন আমার রক্ত দেওয়া হবে ঠিক তখন থেকেই আমরা দুজনই এক অদ্ভূত আত্নীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে বাকী জীবনটা কাটাব, ভাবতেই মনের ভেতরে এক বিশুদ্ধ ভাল লাগা কাজ করছে। রক্ত দিয়েই এক অদৃশ্য আত্নীয়তা গড়ে উঠল - এর থেকে গর্বের বিষয় বড় কিছু হতে পারে না।

জীবনে প্রথম ব্লাড ডোনেট করে আজ আরও খুব তীব্র ভাবে উপলব্ধি করলাম যে সবকিছুর উর্ধ্বে হল মানবতা। যে মানবতা একটা পরিবারের হারানো হাঁসি ফিরিয়ে দিতে পারে, প্রয়োজনের সময় এক ব্যাগ রক্তের বিনিময়ে।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতঃ Narayan Das অভিজ্ঞতাঃ ৮১ (সূচিপত্র)

২০০৯ সালের ৭ই এপ্রিল। রোগিণীর ছেলে কোথাও রক্ত যোগাড় করতে না পেরে আমাকে বলেছিল, ভাই আমার মাকে বাঁচাও। কোন ভয় কাজ করেনি কিন্তু অনেকটা নার্ভাস লাগছিল। রক্ত দানের আগে মনকে এই সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, মারা তো যাব না। কত মানুষই তো রক্ত দিয়েও বেঁচে আছে।

রক্ত দেওয়ার পর কোন সমস্যায় পড়িনি। রোগিনীর মানুষ চেনার কোন ক্ষমতা ছিল না।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

- ভাই রক্ত দিতে পারবেন!
- হাঁ পারবো, কখন কোথায়?

রক্তদান করার জন্য যে সময় বলা হয় তার কিছুক্ষন আগে ফোন আসে, "সরি ভাই, রক্ত লাগবে না, ডোনার ম্যানেজ হয়ে গেছে"

এভাবে একবার নয় আট বার রক্ত দিতে গিয়ে ফিরে এসেছি। কখনো মাঝপথ থেকে কিংবা কখনো হাসপাতালের আশপাশ থেকে।তারপরও হতাশ হইনি। ভাবতাম আমার চেয়েও বেশি রক্তদান করার ইচ্ছা শক্তির মানুষ আছে বলে আমি রক্তদান করার সুযোগ পাচ্ছিনা।

একদিন সকাল বেলা বন্ধুর ফোন। থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্য রক্ত লাগবে। আমি তখন ক্লাসে ছিলাম। ব্যস, তখনই ক্লাস অর্ধেক রেখে চলে এসেছিলাম।

নাহ!সূচঁ দেখে ভয় পাইনি। কিংবা রক্তদানের পর শারিরিক দুর্বলতাও অনুভব করিনি। তবে পিচ্চি বাবুটাকে দেখে কষ্ট পেয়েছিলাম যাকে আমি জীবনের প্রথম রক্ত দান করেছিলাম।

মানুষের সেবা করার ক্ষেত্রে একজন মানুষের অনুপ্রেরণার অনেক প্রয়োজন। আর আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Sajal Mustafiz অভিজ্ঞতাঃ ৮৩ (সূচিপত্র)

আমি সঠিক মনে করতে পারবো না যে প্রথম কবে রক্তদান করেছিলাম। তবে সেটা ২০০৯ সালের ঘটনা।

তখন আমি কোচিং এ ক্লাস করতাম। সেদিন ক্লাসে শুধু রক্ত নিয়ে কথা হল। সেখানে রক্তের গ্রুপ টেস্ট করতে ২০ টাকা লাগবে, আজ যারা রক্তদান করবে তাদের জন্য ফ্রি। সাথে কেক, পানির বোতল আর আপেল, কলা আছে। সেদিনই প্রথম রক্তদান। বিন্দুমাত্র ভয় করেনি, ১৭ বছর বয়সে প্রথম রক্তদান।

আমি জানিনা, আমার রক্ত কি আদৌ কোন ভাল মানুষের শরীরে গিয়েছে কিনা, নাকি বিক্রি করে দিয়েছে! যখন ঢাকায় এসে দেখলাম এরা ৫০০ টাকা ব্যাগ রক্ত বিক্রি করে! আমার জীবনের প্রথম রক্তদান এত ভয়াবহ হবে আমি ভাবতেই পারিনি।

..... আমার রক্ত তোমার জন্য, কিন্তু ব্যবসায়ীর জন্য নয় .....

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ ইমরুল আজিম অভিজ্ঞতাঃ ৮৪ (সূচিপত্র)

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকের কথা। আমি রক্তদান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না। ডিপ্লোমা ফাইনাল পরীক্ষা শেষে ইনস্টিটিউটে গেলাম কোন এক কাজে। হঠাৎ স্যার বললেন তার কোন এক আত্বীয় দুর্ঘটনায় মারাত্বকভাবে আহত হয়েছেন যার জন্য রক্তের দরকার। রক্তের গ্রুপ মিলে যাওয়ায় আমি রাজি হয়ে বললাম, স্যার আমি রক্ত দিব। (যদিও আমার ব্লাড গ্রুপ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম নাহ কারণ স্কুল লাইফে ব্লাড গ্রুপিং করেছিলাম)

হাসপাতালে যাওয়ার পর দেখা গেল রক্তের গ্রুপ ঠিকই আছে। আমি রক্ত দিয়ে চলে আসলাম। রক্ত দেওয়ার পর তেমন কোন অনুভূতি কাজ করেনি। সব কিছু বড়ই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল আমার। শুধু অল্প সুঁই ভীতি ছিল। হ্যাঁ খুবই অল্প।

তবে একটা আফসোস এখনও কাজ করে ..১ম রক্তদানের কয়েকদিন পর স্যারকে ফোন করি রোগীর অবস্থা জানার জন্য ..না থাক কষ্টের স্মৃতি না জানাই ভাল!

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Aditi Hossain Anika অভিজ্ঞতাঃ ৮৫ (সূচিপত্র)

২০১৩ এর এপ্রিল মাস সম্ভবত। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার দিন। পরের দিন ছিল আমার এইচ এস সি পরীক্ষা, কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার। দুপুরে খবরে দেখেছিলাম রানা প্লাজার ভয়াবহ সেই ঘটনা। তারপর ফেসবুকে দেখলাম ঢাকায় শাহবাগে রক্ত নেওয়া হচ্ছে আক্রান্ত মানুষদের জন্য। আর দেরি না করে আমার বন্ধু স্ট্যানলীকে ফোন করি, "চল, রক্ত দিয়ে আসি"। তারপর ২ জন শাহবাগ গিয়ে দেখি প্রচুর ভিড়। আমরা রক্ত দিলাম BSMMU তে। আমার কিন্তু তখনো বয়স ১৮ হয়নি।

বাসায় না জানিয়েই আমি ১ম বার রক্ত দিয়েছিলাম। তবে এখন জানিয়েই দিই। আর প্রতিবার রক্ত দিয়ে অপেক্ষা করি, কবে আবার রক্ত দিব। স্টুডেন্ট হওয়ার সুবিধার্থে এখন ব্লাড গ্রুপিং আর ব্লাড ডোনেটিং ক্যাম্পেইনের সাথে জড়িত আছি। আশা করি আমৃত্যু রক্তের এই আন্দোলনে যুক্ত থাকব।
Happy blood donating.

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Msi Sajib অভিজ্ঞতাঃ ৮৬ (সূচিপত্র)

আমার প্রথম রক্তদান ২০০৮ সালের ৩০ মার্চ। কলেজে মেডিসিন ক্লাবের ক্যাম্পেইনে।

ছোট বেলায় যখন বৈশাখী মেলায় যেতাম, মেলার এক কোণে একটি স্টলে কিছু মানুষ বসে থাকত ডাক্তারি জিনিসপত্র নিয়ে। এটা দেখে তাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ হয়। সেই জানার আগ্রহ থেকে জানতে পারি এখানে মানুষের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে রোগীদের দেয়া হয়। আরো জানতে পারি, বয়স ১৮ হলেই নাকি রক্ত দেয়া যায়! এভাবেই প্রতি বছর মেলায় গিয়ে ঐ স্টলে গিয়ে একবার হলেও ঘুরে আসি আর নিজের বয়স গুনতে থাকি কবে আমার বয়স ১৮ হবে।

মাঝে আমার ছোট বোন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার আগে অনেক রক্তের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোন রক্তের অভাব হয়নি। সেই থেকে আমার রক্ত দেয়ার ইচ্ছে আরও বেড়ে গেল। অবশেষে ২০০৮ সালে কলেজে মেডিসিন ক্লাবের ক্যাম্পেইনে আমার প্রথম ডোনেশন সম্পন্ন হল। রক্তদানের ইচ্ছে যেহেতু ছোট বেলা থেকেই, তাই রক্তদানের পূর্বেই খুব উৎফুল্ল ছিলাম। রক্তদান করার পরে অপেক্ষা করতে থাকি পরবর্তী বারের জন্য!

২য় রক্তদানের সুযোগ এলো ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের রাতে! এক বড় ভাইয়ের খালাতো বোনের সিজার হওয়ায় রক্তের দরকার ছিল! রাত বারোটায় মেডিকেলে গিয়ে রক্তদান করে বাসায় ফিরি ১:৩০ টায়।

প্রতিবার রক্তদানের পরেই যে অনুভূতি কাজ করে তা লিখে বুঝানো যাবে না। অন্যরকম আত্মতৃপ্তি পাই।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Jahadul Islam Nerob অভিজ্ঞতাঃ ৮৭ (সূচিপত্র)

কয়েকদিন ধরেই মনটা খুব খারাপ, কোন কিছুতেই মনযোগ দিতে পারছিনা। কেমন যেন অস্থিরতা কাজ করছে নিজের মধ্যে। গলা দিয়ে নামছেনা খাবারও।

ঘটনা হলো, সেদিন পাশের বাসার বড় আপুর (যিনি প্রেগন্যান্ট অবস্থায় বাবার বাড়ি এসেছিলেন এখান থেকে যাতায়াত ব্যবস্থা সুবিধা বলে) হটাৎ ব্যাথা উঠেছে। তা নিয়ে শোরগোল। বাড়িতে কেউ নাই, আমিই দৌড়ালাম গাড়ির জন্য। তাড়াহুড়ো করে নিয়ে গেলাম নিকটস্থ হাসপাতালে। ডাঃ বললেন অপারেশন লাগবে এক্ষুনি। অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার পর ভেতর থেকে খবর এলো রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। ৩০ মিনিটের মধ্যেই রক্ত লাগবে, নতুবা বাচ্চা এবং মা দুজনের জন্যই খারাপ হবে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কোথায় যাবো? কি করবো? কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হটাৎ এক বড় ভাইয়ের কথা মনে পড়তেই ফোন দিলাম ওনাকে। তিনি বললেন কেমনে সম্ভব ৩০ মিনিটের মধ্য রক্তের ব্যবস্থা করা? আমার নিজেরও রক্তের গ্রুপ জানা ছিলো না। তখন ১৮ হয়নি আমার। এইসব দৌড়াদৌড়ি মধ্যেই অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, পেছনে নার্স। নার্সের হাতে তুলার আস্তরণে মোড়া ফুটফুটে একটি বাচ্চা। কাছে আসতেই বুঝলাম, বাচ্চাটি নিস্প্রান। অথচ দেখে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে। একটু আওয়াজ করলে এখনই ঘুম থেকে জেগে উঠে কান্না করবে চিৎকার করে। নাহ, বাচ্চাটি কান্না করেনি। ডাক্তারদের মধ্যেও কোন ধরনের প্রচেষ্টা ছিলো না কান্না করানোর। তখন পৃথিবীর সমস্ত কান্না এসে আটকে ছিলো আমার গলায়।

আপুর জ্ঞান ফেরার পর এ সংবাদ শোনে ওনার গগন বিদারী চিৎকার করা কান্না দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি আর। সরে এসেছি সামনে থেকে।

নিজেকে নিজের জন্য কখনোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনি। নিজের জন্য কখনোই আফসোস হয়নি আমার। আপুর এই ট্রাজেডির পর নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হতো। আপুর সামনে দাঁড়াতে পারতাম না। মনে হতো এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এর জন্য দায়ী আমরা সবাই।

অপরাধ বোধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ব করার সুযোগ করে দিলো আমার এক বন্ধু। আমার ১৮ তম জন্মদিনের প্রথম কাজটিই ছিলো আমার প্রথম রক্তদান। বন্ধুর ফোন পেয়ে দৌঁড়ালাম রক্ত দিতে আরেকজন সদ্য মা হতে যাওয়া বোনকে।

এরপর থেকেই আর থামিনি। চালিয়ে গিয়েছি রক্তের জন্য যুদ্ধ। অনেকের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি সাধ্যমত। এখনো অসাধারণ কিছু মানুষকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি নিজের দায়িত্ববোধ থেকে, বিবেকের জায়গা থেকে।
তারপরও ভুলতে পারিনা আপুর সেই ফুটফুটে বাচ্চার কথা। আচ্ছা, আমাদেরকে কি সে ক্ষমা করবে? আমরা কি সে বাচ্চার পৃথিবীর অধিকার কেড়ে নিই নি? ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল মা। অনাগত সকল ভবিষ্যৎ।

রক্তদাতাঃ Md Mahadi Hasan Sagor অভিজ্ঞতাঃ ৮৮ (সূচিপত্র)

২০০৪ সালের আগষ্ট মাসের ১১ তারিখ খুব সম্ভবত, কলেজের প্রথম ক্লাসের দিন। সন্ধানীর সহযোগীতায় রোবার স্কাউট আয়োজন করে সেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। রোভারে ছিলো আমাদের কলোনীরই একজন বড় ভাই। আমি যখন রক্ত দিতে চাইলাম তখনই ওই বড় ভাই বাধা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর অনেক চেষ্টা করে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে ভাইয়াকে রাজি করে জীবনের প্রথম বার রক্তদান করতে পেরেছিলাম। রক্তদানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে শ্রেনীকক্ষে যেতে যেতে ১০ মিনিট দেরি, ক্লাশে ঢুকার জন্য স্যারের অনুমতি চাওয়ার সাথে সাথে স্যারের উত্তর, আপনার জন্যই তো অপেক্ষা করছি। বসতে যাবো এমন সময় স্যার আমার হাতের ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ টা খেয়াল করলেন। স্যার জানতে চাইলেন হাতে ব্যান্ডেজ কেন? আমি রক্তদানের কথা বলা মাত্রই স্যার অনেক খুশি হলেন। এবং ওই ক্লাশের বেশিরভাগ সময়ই উনি রক্তদানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বাসায় ফেরার পর তো আমার আদর আপ্যায়ন বেড়ে গেলো, আগের তুলনায় অতিরিক্ত দুধ-ডিম খাওয়ার যন্ত্রনায় আমি অস্থির হয়ে গেছিলাম। যদিও আম্মু কিছুটা রাগ করেছিলেন কিন্তু আমার আব্বু তা কাটিয়ে নিয়েছিলেন আম্মুকে বুঝিয়ে শুনিয়ে।

আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত ২৬ বার রক্তদান করেছি এবং যতদিন সুস্থ থাকবো ততদিন নিয়মিত রক্তদান করে যাবো ইনশাআল্লাহ।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

বিজয় দিবসে রক্ত ঝরল, আমারও। শেষ পর্যন্ত বহুল প্রতীক্ষিত রক্ত দেওয়ার কাজটি করলাম। এবার তবে রক্ত ঝরার গল্পটি বলি।

রক্ত সঞ্চালন রুমে ঢুকতেই আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল মিষ্টি চেহারার ফুটফুটে মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। তালিকা ভুক্তির পর একজন এসে সুঁই ঢুকিয়ে দিল হাতে, তেমন ব্যথা লাগল না। তবে রক্তের ফ্লো ছিল একেবারেই কম। মনে মনে ভাবলাম, ওজন কম বলেই হয়ত রক্ত বেরুচ্ছে না আমার। বেশ অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও সামান্য রক্ত জমা হয়েছে। তারপর হঠাৎ সুঁইটা ছুটে গেল হাত থেকে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে হাতে, শার্টে, মেঝেতে পড়তে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি ডাকলাম, সুঁই বেরিয়ে গেছে। ছেলেটা এসে আমার হাতে একটা তুলা চেপে ধরে হাতটা ভাঁজ করে দিল। তারপর মেঝে আর অন্যান্য জায়গা থেকে রক্ত মুছে নিল।

বেশ অনেকক্ষণ পর, এক বয়স্ক দাদু আসলেন। ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি আর রক্ত দিতে চাই কিনা। আমি বললাম, সেটা তোমরা বুঝবে, তোমরা আর রক্ত নিতে চাও কিনা। কারণ আমার এখন পর্যন্ত কোন ফিলিংস নাই। পাশের একজন বলল, আপনার ওজন কম, আপনি আর রক্ত দিয়েন না।

দাদু এসে বললেন, রক্ত অবশ্যই দিবে। রক্ত দেওয়ার পরই তো ওজন বাড়বে। আমি বললাম, রক্ত তো বেরুচ্ছে না! দাদু বলল, রক্ত বেরুবে না মানে! সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো রক্ত বেরুবে! আমি হেসে ফেললাম, দাদুর কাব্যিক উপমা শুনে। তারপর দাদু খেয়াল করে দেখলেন, সুঁইয়ের মাথায় কিছু একটা সমস্যা ছিল, যার কারণে রক্তের ফ্লো ছিলনা। দাদু সেটা ঠিক করে এবার আমার বাম হাতে পুশ করলেন।

এদিকে সেই মিষ্টি চেহারার ছটফটে মেডিক্যাল স্টুডেন্ট ছটফট করছিল। আমি তাকে বললাম, আমার ডান হাতের জন্য আরেকটু তুলা নিয়ে আসুন। সে এসে তুলা দিয়ে ডান হাতের পুরনো তুলাটা ফেলে দিল। বলল, রক্ত তো বন্ধ হয়েছে; দাঁড়ান, আপনাকে আমি ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দেই। তারপর যত্নের সহিত আমাকে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিলেন।

একটু বেশি সময় নিয়ে আমার রক্তের ব্যাগ পূর্ণ হল। দাদু বললেন, এইতো রক্ত এসেছে! আর তোমার হিমোগ্লোবিন ১৮ এর উপরে। বেশি করে পানি খাবা।

অতঃপর, সেই মিষ্টি চেহারার ফুটফুটে হবু ডাক্তার সবাইকে সালাম দিয়ে চলে গেলো। তার কিছুক্ষণ পর আমি কোন ধরনের ক্লান্তি বা দূর্বলতা ছাড়াই ফুরফুরে মেজাজে বেরিয়ে আসলাম। ফুটফুটে হবু ডাক্তারের কথা ভাবতে ভাবতে।

বিজয় দিবস স্পেশাল বলাই যায়।

রক্তদাতাঃ Md Moshiur Rahman Mim অভিজ্ঞতাঃ ৯০ (সূচিপত্র)

সময়টা ছিল ২০১১ সালের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকের কথা। আমি তখন স্টাম স্টামফোর্ড ইউনিভারসিটির ছাত্র। সবে মাত্র ১ম ইয়ার শেষ করেছি। কিন্তু ব্লাড ডোনেট সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই।

যখন বি এ এফ শাহীন কলেজে পড়তাম তখন এক বন্ধুর বোনের ডেলিভারির জন্য ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেলে ব্লাড দিতে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৭ কি ১৮। কিন্তু আমার প্রেশার লো থাকার কারনে ব্লাড নেয়নি।

যাইহোক, ব্লাড লাগবে আমার বড় চাচার। তিনি সম্ভবত লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। সাত মসজিদ রোডের সিটি হসপাতালে ভর্তি করলাম। অনেক ব্লাড লাগবে। কোন ভাবেই মেনেজ হচ্ছিল না। অবশেসে আমি বললাম আমি দিব।

জীবনে কখনো ব্লাড দেই নি, এটাই প্রথম। ভয়ে ভয়ে মেডিকেলে গেলাম। কোন ভাবেই সাহস পাচ্ছিলাম না। বুকের মাঝে ধুক-ধুক শুরু হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল। এক পর্যায়ে দেখি আমার হাঁটু কাপা শুরু হয়ে গেল। নিজেকে কোন ভাবেই সামাল দিতে পারছিলাম না। এরকম সময় কি করবো বুঝে উঠে পারছিলাম না। হঠাৎ করে মনে হল আমার বাবা না মুক্তিযোদ্ধা, আমি না মুক্তিযোদ্ধার সন্তান! তখন আমি নিজেকে নিজেই সাহস দিতে শুরু করলাম। মনে মনে ভাবলাম শুধু এক ব্যাগ রক্তই তো, আমাকে তো আর মেরে ফেলবেনা, আমিতো আর মরে যাব না। আস্তে আস্তে নিজের মনে নিজেই সাহস যোগাতে শুরু করলাম।

অবশেষে আমি সাকসেসফুল। সেই থেকে শুরু, আজ অবধি চলছে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।

রক্ত দিন, প্রাণ বাঁচান

৭ এপ্রিল, ২০১৫ সাল। দুপুর পর্যন্ত ক্লাস করে রুমে ফিরতেই সুখবরটা পেলাম। রক্ত দিতে হবে। উত্তেজনা অনেক। জীবনের প্রথম রক্তদান বলে কথা। রোগী এক বড় ভাইয়ের এলাকার। ভালভাবে চিনেন না। কি সমস্যা রোগীর অজানা-সেই ভাই ও জানেন না। তাতে কি।

কথা না বাড়িয়ে বেড়িয়ে পড়লাম সেই ভাইসহ। অটোরিকশা ভাড়া আমিই মেটালাম।
ক্লিনিকে রোগীর ছেলে অপেক্ষায় ছিল। আমাদের দেখে তিনি চিন্তামুক্ত হলেন তা উনার চেহারায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তারপর ঘন্টাখানিক অপেক্ষা। বিভিন্ন টেষ্ট। অবশেষে সেই শুভক্ষন। অপেক্ষার শুভাবশান।
রোগীর সাথে দেখা করার সৌভাগ্য হল না।
রক্ত নেবার দায়িত্বে থাকা ছেলেটি বলল, প্রথম রক্তদান অথচ ভয় পাননি, আপনি সেই দলের একজন।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Abdullah Bin Aman Bappy অভিজ্ঞতাঃ ৯২ (সূচিপত্র)

ঐটা ছিল ২০১০ সাল। আমার এক বন্ধু জুনায়েদ একদিন রাতে আমাকে কল দিয়ে বলল,
- মামা তোর রক্তের গ্রুপ তো ও পজেটিভ, তাই না?
- আমি বললাম, হ্যাঁ।
- মামা আমার এলাকার এক ভাই বাইক এক্সিডেন্ট করেছে আর আর এখন বৈশাখী ক্লিনিকে ভর্তি আছে। অবস্থা খুব খারাপ। তিন ব্যাগ রক্ত লাগবে। আমার এক ভাই ১ব্যাগ আর আমি ১ ব্যাগ রক্ত দিছি।কাল সকালে আরও এক ব্যাগ লাগবে, কিন্তু ডোনার পাচ্ছি না। তাই তুই কাল রক্ত দিবি।
- আমি তো এর আগে কখনো রক্ত দেই নি। তাই ভয় লাগছে। কিন্তু তবুও দিব।
- আচ্ছা কাল ১০ টায় কোর্ট স্টেশনে দেখা হচ্ছে।
- ওকে।

এর পর থেকে আমার চিন্তা শুরু হয় যে, জীবনে প্রথম রক্ত দিবো কিন্তু শুনেছি রক্ত দিলে মাথা ঘোরে। তাহলে রক্ত দেয়ার পর বাসায় আসার সময় যদি রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যাই আর অত মোটা সূচ ঢুকানোর সময় কি পরিমান ব্যাথা যে লাগবে! এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় মনস্থির করলাম যা হয় হবে। আমি রক্ত দিবো। কারন তাতে যদি একজনের জীবন বাঁচে তাহলে আমার পাপের বোঝা কিছু কম হবে।

পরদিন সকালে বৈশাখী ক্লিনিকে গেলাম। যাবার পর রোগীর মা আমাদের দেখে তো জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। তার নাকি ওই একটাই ছেলে। এদিকে রোগীর অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগলো। ডান হাত ভেঙে গেছে, মাথা ফেটে যাবার কারনে ৫টা সেলাই লেগেছে আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, বাম পায়ের হাড় মাঝ থেকে ভেঙে মাংস বের হয়ে এসেছে।

এর পর আমার সকল চিন্তা আর ভয় কোথাই যে পালালো তা বলতে পারবো না। তারপর আমি, জুনায়েদ আর রোগীর চাচা গেলাম সদর হসপিটালে রক্ত দেয়ার জন্য।কারন বৈশাখী ক্লিনিকে রক্ত নেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। সদর হসপিটালে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর রক্ত দিলাম।রক্ত দেয়ার পর গ্লুকোজ, কোক আর হসপিটালের গেট থেকে চা খেয়ে আমরা তিনজন আবার ক্লিনিকে গেলাম। যাবার পর রোগীর আম্মা আমাকে জোর করে এক গ্লাস দুধ আর একটা সিদ্ধ ডিম খাওয়ালো। এরপর আসার সময় হাতে ৫০০ টাকার একটা নোট দিয়ে বলে ফলমূল কিনে খেয়ো। আমি টাকা নিতে রাজি না আর ঐদিকে ওরা টাকা দিবেই। অবশেষে ১০০ টাকা জুনায়েদের হাতে দিয়ে বলল, এইটা দিয়ে রিক্সা ভাড়া দিস আর চা-টা কিছু খাস। এরপর আমি আর জুনায়েদ চলে আসলাম।

মজার বিষয় হচ্ছে, সূচ ফোটানোর যেমন ব্যাথা লাগবে ভেবেছিলাম তার ১ ভাগ ব্যাথাও লাগেনি আর রক্ত দেয়ার পর মাথা ঘুরবে, এ হবে ও হবে, এসব ধারনা পুরোটাই ছিল ভুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছি বেশ কয়েক দিনই হল। তেমন কোন বলার মতো কাজ করিনি, যা নিজেকে শিহরিত করে। অনেককে অনেকভাবে হয়তো সাহায্য করেছি বটে তবে সেটা ছিল আর্থিক। এমন কিছু করতে চাচ্ছিলাম যা আমাকে ও যাকে সাহায্য করবো তাকেও আন্দোলিত করবে।

হঠাৎ করেই সুযোগটা পেয়ে গেলাম । একদিন সকালে সবে মাত্র ক্লাসে ঢুকেছি। তখনই আমার বন্ধু ফোন করে বলছে তার বাবার জন্য জরুরী রক্ত লাগবে। কোন কিছু না ভেবেই বললাম আমি আছি। ব্যস যেই ভাবা সেই কাজ। বের হয়ে গেলাম ক্লাস থেকে। আর সোজা চলে গেলাম হাসপাতালে । ওখানে গিয়ে বসে আছি আর ভাবছি কখন নিবে আমার রক্ত, কখন! একটা সময়ে জানলাম ক্রস ম্যাচিং আমার সাথে মিলে গেল । তারপর এক ব্যাগ রক্ত দিলাম।

যেখানে পুরোটাতে ছিল ভালোবাসার ছোঁয়া । অনেক অনেক খুশী হয়েছিলাম সেদিন রক্ত দিতে পেরে। ভাগ্যবানদের একজনই ভেবেছিলাম সেদিন আমি নিজেকে। কিন্তু আমার এই রক্ত রক্ষা করতে পারেনি সেই প্রাণটিকে ।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ Fokhor Uddin অভিজ্ঞতাঃ ৯৪ (সূচিপত্র)

আমার রক্ত দেয়ার ইচ্ছা জাগে ২০০৯ সালে, তখন আমার আপুর জন্যে রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল, অনেক কষ্টে যোগার করা হয়েছিল ১ ব্যাগ আর ১ ব্যাগ চার হাজার টাকায় কেনা হয়েছিল। ঢাকায় অপারেশন হওয়ার কারনে আমার পরিবারের কেউ রক্ত দিতে পারেনি।

২০০৯-১০-১১-১২ পেরিয়েও আমার রক্তদানে ইচ্ছা মনের মধ্যেই রয়ে গেল। ২০১৩ সালের শুরুতে মেসের এক বড়ভাই Ahmed Abdullah রক্তদান করে আসলেন। এর পর থেকেই দেখছি ৩-৪ মাস পর পর রক্ত দিচ্ছেন। ২০১৪ সালের শুরুতে ওনাকে বললাম- ভাই আমি রক্ত দিব। বড় ভাই Ripon Niloy উনার মাধ্যমে নিশ্চিত হলাম আমার ব্লাড গ্রুপ এ পজেটিভ, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম এবার রক্তদান করবই! হৃদয় খাঁন রনি ভাইয়ের একটা পোষ্টে কমেন্ট করি- আমি রক্তদান করতে চাই। আমার নিজের ওয়ালেও পোষ্ট করি। ভাবি রক্তের কি কারো প্রয়োজন নেই? রনি ভাই Toukir A Shaon ভাই Philanthropist Salauddin Bijoy ভাইয়ের পোষ্টে খুঁজতে থাকি A+ রোগী, একদিন পেয়েও গেলাম। নুরজাহান হাসপাতালে A+ রক্ত প্রয়োজন! ফোন দিলাম, ম্যানেজড!

পরের দিন আরেকটা পেলাম। এবার ফোন দিয়ে জানতে পারলাম, রোগী মারা গিয়েছে। খুব খারাপ লাগল, ভিতরটা কষ্টে ফেটে যাচ্ছিল। আমি রোগী খুজে পাইনা, আর রোগী ডোনার খুঁজে পায় না। রনি ভাইয়ের ইনবক্সে আমার নাম্বার দিয়ে বললাম যে কোন সময় আমি রেডি, জাষ্ট একটা ফোন দিবেন। সপ্তাহ খানেক পরে ফোন পেলাম। কিডনি ডায়ালোসিসের এক রোগীর জন্যে A+ রক্ত লাগবে। আমি তো অনেক খুশি, যাক শেষ পর্যন্ত এক ব্যবস্থা হল। আমার ভিতর সুরমার পানি যেন ২০০ কিলোঃ বেগে চলতে লাগল! আমার কারনে একটা রোগী বেঁচে থাকবে, নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ হচ্ছে। সবার কাছে বলতে লাগলাম আমি আজ প্রথম রক্ত দিতে যাচ্ছি। আবদুল্লাহ ভাইকে জানালাম, উনিও অনেক খুশি হলেন। পরামর্শ মূলক বক্তব্য বেশি করে পানি খেতে হবে। ওজন ৫০ কেজি আছে তো? ৫০ কেজি না হলে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন নাই।

আমার ওজন ৫০-৫১ কেজি আছে মাস দুয়েক যাবত। সন্দেহ ছিল যদি কোন ভাবেই কমে যায় তাইলে আমার থেকে রক্ত নিবে না! রক্ত না নিলে রোগীকে রক্ত দেয়া যাবেনা! রক্ত না দিতে পারলে রোগী মারা যাবে! ওয়াও আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে! না আমাকে রক্ত দিতেই হবে! ওজন বাড়াতেই হবে! শর্টপ্যান্টের উপর নরমাল প্যান্ট এর উপর মেসের এক বড় ভাইয়ের জিন্স প্যান্ট পরলাম! সাথে লিটার তিনেক পানি খেয়ে নিলাম। ব্লাড ব্যাংকের ডাক্তার আমাকে দেখে ওজন মাপতে চাইলেন। এতো কিছুর পরেও ভয় পেয়ে গেলাম। নাহ ৫৪ কেজি হল! অনেক ভয় হচ্ছিলো এতো বড় সুই, কত ব্যাথা পাব আল্লাই জানে, সুই আমার কাছে নিয়ে আসছে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিতে ইচ্ছে করছিল। এতো মানুষের সামনে চিৎকার করলে মানুষ কি বলবে! অন্য দিকে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছি। যতটুকু ব্যাথা পাব মনে করেছিলাম ততটুকু না, আমার কাছে মনে হলো ক্রসম্যাচিং এর জন্যে রক্ত নেয়ার সময় যে ব্যাথা পাইছি, তার থেকে কোন ভাবেই বেশি না! অনেকে বলছিল- মাথা ঘুরবে, বমি বমি হতে পারে। না আমার তেমন কিছুই হয়নি।

বেঁচে থাকুক আরেকটি হাসি।

রক্তদাতাঃ অগ্নিঝরা নাজমুল অভিজ্ঞতাঃ ৯৫ (সূচিপত্র)

আমাদের রহনপুরে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ততটা উন্নত না হওয়ায় রক্তদান ততটা সচরাচর ছিল না, তাই আমি সুযোগটা পাচ্ছিলাম না। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসের ২০ তারিখ এক ছোটভাই ফোন দিয়ে বললো তার এক ভাইয়ের ও পজেটিভ রক্ত লাগবে। তার প্রতি মাসে ১ ব্যাগ রক্ত লাগে, কথাটা শুনে মনে হলো এবারই সুযোগ। তাই আর দেরি না করে আমার বন্ধুদের ফোন করে রক্তদানের যোগ্যতাগুলো আবার জেনে নিলাম এবং কনফার্ম করে ক্লিনিকের উদ্দেশ্য রওনা দিলাম।

কিন্তু শুরু হয়ে গেল ভয়ের রাজ্যের আনাগোনা। মনে মনে ভাবছিলাম যে আমি জীবনে কোনোদিন ১টা ইঞ্জেকশন পর্যন্ত করছি কিনা মনে নেই, তাহলে আজ আমার কি হবে! এসব ভাবি আর সায়েম, তোহিদ কে বারবার ফোন করে বলতে থাকি, খুব বেশি ব্যাথা করবে না তো? আমি পারবো তো?
তারা আমাকে শুধু সাহস দিয়েই যাচ্ছিলো। এবার ক্লিনিকে গিয়ে বেডে শুয়ে প্যাথলোজিস্ট ভাইয়া পিক করার আগে আমাকে একটা ম্যাগাজিন ধরিয়ে পড়তে বলেন এবং আমি মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু করি। সাথে ছিল ছোট ভাই হৃদয় সেও আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে এর মধ্যেই পিক করা শেষ। তবে যতটা ভয়ের রাজ্যে গিয়েছিলাম, তার কিছুই হয়নি। সামান্য মশায় কামড়ালে যেরকম ব্যাথা হয় ঠিক সেরকম ব্যাথা হয়েছিল।

তারপরের অনুভুতি যা হয়েছিলো তার প্রতিফলন হিসেবে এখনও আমি নিয়মিত রক্তদান করে যাচ্ছি। রক্তদানের মধ্যে যে এত আনন্দ হয় যারা দেননি তাদের কে বলব, আপনারা এখনও অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত আছেন।

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই তার ভয় নাই....
নি:স্বার্থে রক্ত যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই...

রক্ত দিন জীবন বাঁচান

দিনটি ছিল ২০১১ সালের ১০ই অক্টোবর, সোমবার। আমি তখন ইউনিভারসিটিতে হিউমেন ফিজিওলজি ক্লাসে ছিলাম। ডাঃ নূপুর ম্যাদাম আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। হঠাৎ আমাদের ইউনিভারসিটির শ্রদ্ধেয় ফকরুল ইসলাম স্যার আমাদের ক্লাসে এসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, আমার বাবা খুব অসুস্থ, উনার কিডনিতে একটা মেজর অপারেশন হবে, তাই আমার ৪ ব্যাগ O(+ve) রক্তের প্রয়োজন। স্যার সবাইকে অনুরোধ করে বললেন, যাদের রক্তের গ্রুপ O(+ve) তাদের মধ্যে কি যেকোন ৪ জন আমার বাবাকে সেচ্ছায় রক্তদান করবেন? তখন আমাদের ক্লাসের কেউই উঠে দাঁড়ালো না। সবশেষে আমি একাই উঠে দাঁড়ালাম স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য। তারপর আমাকে দেখে আমার দুই সহপাঠীও স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য উঠে দাঁড়ালো। তারপর স্যার আমাদের ৩ জনকে নিয়ে একটি সিএনজি ভাড়া করে পিজি হাসপাতালে চলে গেলেন।

তারপর হাসপাতালে গিয়ে আগে স্যারের বাবার সাথে পরিচিত হলাম, উনার আশীর্বাদ নিলাম। তারপর ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে আমরা ৩ জন সেচ্ছায় রক্তদান করলাম। যখন রক্তদান করছিলাম তখন আমি কোন ধরনের ভয় অনুভব করি নাই। তখন শুধু মনে মনে একটি কথাই ভাবছিলাম যে, আমি একজন মুমূর্ষ রোগীকে রক্তদান করছি, এটি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের একটি বিষয়। তখন আরও ভাবছিলাম যে, আমার এক ব্যাগ রক্তে যদি একজন মুমূর্ষ রোগীর জীবন বাঁচে তাহলে এর থেকে বড় পাওয়া আর আমার জীবনে কিছুই হতে পারে না। এবং তখন থেকেই আমি নিজের বিবেকের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে যতদিন আমি শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকব ততদিন সেচ্ছায় রক্তদান করে যাব। এবং অন্যদেরকেও এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করব। তাই আপনারা সবাই আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন যেন আমি আমার প্রতিজ্ঞা সঠিকভাবে পালন করতে পারি।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদানের ব্যাপারে অনেক দিন ধরেই শুনে আসছি। কিন্তু কেউ আমাকে এ ব্যাপারে নক না করায় ২০১০ সালের একদিন নিজেই আগ্রহ নিয়ে গেলাম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন ডাক্তারদের দায়িত্বে পরিচালিত 'সন্ধানী'তে। সেটাই আমার জীবনের প্রথম রক্তদান। সূঁচ ফোটানোর সময় হালকা ব্যথা লেগেছিল একটু, তবে রক্ত দেয়ার পরে শরীরটা ঝরঝরে লাগছিল। মনে একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করছিল।

রক্ত দেয়ার একটু পরে আমাকে একটা স্টারশিপ জুস খেতে দেন একজন আপু। নিতে চাচ্ছিলাম না, কারণ এটা আমার কাছে অনেকটা প্রতিদানের মত মনে হচ্ছিল। তবে উনি জোরাজুরি করায় জুস নিলাম।
এরপর উনি আমাকে জানালেন যে, রক্তে কোন সমস্যা থাকলে বা রোগ পাওয়া গেলে সেটা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে জানানো হবে।

এরপর থেকেই শুরু হল টেনশন। যদি কিছু পাওয়া যায়! কিন্তু না, ৪ দিন পরে একটা ফোন আসলো 'সন্ধানী' থেকে, জানালেন আমার রক্তে কোনো সমস্যা নেই। অনেক বড় টেনশন থেকে মুক্ত হলাম সেদিন। এরপর থেকে শুরু হয় আমার নিয়মিত রক্তদান।

মাঝে কয়েকবছর দেশের বাইরে ছিলাম, কিন্তু ফিরে এসে আবার আগের মতই নিয়মিত রক্তদান চালিয়ে যাচ্ছি। সবাইকে রক্তদানের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, যার ফলে এখন অনেকেই নিয়মিত রক্তদাতা। ইনশাল্লাহ রক্তের অভাবে আর কোন রোগীর মৃত্যু হবেনা।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ K.h. Mohammad Yousuf অভিজ্ঞতাঃ ১৮ (সূচিপত্র)

আমার জীবনে এক সুপার ডেনারের রক্তদান স্বরণীয় হয়ে থাকবে। আজ তার রক্তদান সম্পর্কেই লিখছি!দিনটি ছিল শুক্রবার। সকাল ৮টায় মোবাইলের রিংটোন বেজে উটলো! অপর পাশে একজন মহিলা খুব হতাশা নিয়ে বলছে- "অ বাপ তুই ইসুব হদ্দে নে..।" আমি বললাম- "জ্বী আমি ইউসুফ বলছি। কিন্তু কেন?" উনি হতাশ বললেন, উনার মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ। পেটে বাচ্চা মারা গিয়েছে, অপারেশন করতে রক্ত লাগবে। ডাক্তার বলেছে রক্ত ছাড়া রোগীকে বাঁচানো সম্ভব না। আমি ওনার কথা শুনে রোগীর অবস্থা বুঝতে পেরে বললাম ডাক্তার অথবা নার্সকে দিতে। উনি ডিউটি ডাক্তারকে মোবাইলটা দিলেন আমার সাথে কথা বলার জন্য। ডাক্তার জানালেন, জরুরী দুই ব্যাগ AB- রক্ত প্রয়োজন। গ্রুপ শুনে নিজে নিজে ভাবলাম, এত সকালে এই দুর্লভ গ্রুপ কিভাবে সম্ভব! উনি আরও জানালেন যত দ্রুত সম্ভব কমপক্ষে এক ব্যাগ লাগবেই। আমি ওনাকে আশ্বস্ত করলাম, চেষ্টা করতেছি বলে।

বেশ কয়েক যায়গায় ফোন দিলাম ডোনারে খোজে। শুক্রবার ছুটির দিন তাই অনেকে বাড়ি গিয়েছে নাহয় ফোন ধরছে না। একটু টেনশনে পরে গেলাম। শেষমেষ রক্তের জন্য পোষ্ট দিলাম ফেইসবুকে কয়েকটা গ্রুপে। ১১ টার দিকে একজন রক্তদাতা আমার ফেসবুক ইনবক্সে নক করে। ছেলেটার নাম মোঃ সজিব। উনাকে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে বলায় উনি রক্ত দিতে রাজি হন। উনি পটিয়া থেকে রক্ত দেওয়ার জন্য আসতে প্রস্তুত। পটিয়া থেকে চট্টগ্রাম শহরে আসতে সময় লাগে ৪৫ মিনিটের মত। এদিকে রোগীর আত্মীয় আমাকে ফোন দিচ্ছে তো দিচ্ছেই! আমি তাদেরকে আশা দিলাম ৩ টার মধ্যে রক্ত ম্যানেজ করে দিব। তাদেরকে রিকুজিশন পেপার নিয়ে আন্দরকিল্লা রেড ক্রিসেন্টে চলে আসতে বলি। অন্তিম অপেক্ষার পর ২ টা ৪৫ মিনিটে ফোন দেয় সজিব ভাই। খুব হ্যাংলা পাতলা শরীর, দেখে মনে হল বয়স খুব বেশি হলে ১৫-১৬ বছর।তাই আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম তার বয়স জিঙ্গেস করলাম। সে জানাল, ১৭ বছর ১০ মাস। দুর্লভ গ্রুপ তাই রিস্ক নেওয়ার জন্য চিন্তা করলাম, উনিও রাজি। রক্তদানের জন্য ফরম পূরণ করার পর ওজন মেপে দেখা গেল ৪৪ কেজি। তখন রেড ক্রিসেন্টের লোকেরা রক্ত নিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এদিকে রোগীর অবস্হাও খুব খারাপ। অবশেষে রেড ক্রিসেন্টের কর্তব্যরত ডাক্তার ডাঃ মিনহাজ স্যারের সাথে কথা বলায় স্যার বুঝতে পারল এসময় আর কোথাও AB- পাওয়া সম্ভব না। ডোনার অনুযায়ী ৩৫০ এম.এল. রক্ত নেয়ার যায়। অন্য দিকে সজিব ভাইও আমাকে অভয় দিল উনি পুরোপুরি ঠিক আছেন, উনার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি কিছু হয়েও যায় সে জন্য উনি কাউকে দোষী করবে না। অবশেষে উনার কাছ থেকে রক্ত নেয়া হল। এটাই ছিল উনার প্রথম রক্তদান।

আমরা ওনার মনোবল দেখে অবাক হলাম। জানতে পারলাম, তিনি ৩ বোনের এক ভাই, উনার আম্মা একা কোথাও যেতে দেয় না। তাই আম্মুকে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাবে বলে রক্তদান করতে এসেছে। আমি শুনে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। একজন মানুষ অন্যজন মানুষের জীবন বাঁচাতে বাসায় মিথ্যা এত দূর এল!

আমার কাছে স্বরনীয় হয়ে থাকবে সজিব ভাইয়ের রক্তদান। পারে ওনাকে নৌকা দিয়ে কর্নফুলী ব্রীজ পার করে দিয়েছিলাম।

ইচ্ছে ছিলো না বলার, উপকার করে বলে দিলে নাকি খোঁটা হয়! মা শিখিয়েছিলেন সেই ছোটো বেলায়, এখনো দিব্যি মনে আছে। ও আমাকে রিফিউজ করে গেছে, আমি উল্টো হাঁটা দিয়ে জীবনটাকে নতুন করে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম, অনেক গুলো কষ্ট বুকে ধারন করে ও কি নিদারুণ দিনযাপন করে যাচ্ছি - ভাবতেও অবাক লাগে।
ফেইসবুকের একটা পোস্ট দেখলাম, ব্রেইন টিউমার অপারেশন এর জন্য জরুরী রক্ত প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ দুর্লভ এ নেগেটিভ! তখনো আমার রক্ত দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেনি, অবশ্য জানি যে আল্লাহ আমার মত একটা গরিব মানুষকে দামী রক্ত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন! যাই হোক, সিদ্ধান্ত নিলাম যে রক্ত দেবো। বাসার কাছেই স্কয়ার হসপিটাল। যোগাযোগ এর নাম্বার এ কল করতেই এক লোক ফোন ধরলো, বললাম যে ভাইয়া আমার ব্লাড গ্রুপ এ নেগেটিভ, ফেইসবুকে বিজ্ঞাপন দেখে ব্লাড দিতে এসেছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি আমাকে নিয়ে স্যাম্পল ম্যাচিং রুমে নিয়ে গেলেন, কিছুক্ষন পর মধ্যে জানালো আমার ব্লাড পারফেক্টলী ম্যাচ করেছে। যাই হউক জানতে পারলাম, ওই লোকের ছোটবোনই হলো পেশেন্ট।

দুই ব্যাগ রক্তের দরকার থাকলেও আপাতত ওই সময়ের জন্য এক ব্যাগ খুবই ইমারজেন্সি ছিল। রক্তদান ক্রলাম, তারপর রোগীর অপারেশন শুরু হয়। আল্লাহর রহমতে ভালো মতো সম্পন্ন হয় ওর অপারেশন।

প্রায়ই ওর ভাইয়ের সাথে কথা হতো ওর অবস্থা জানার জন্য। আমার প্রথম ব্লাড নিল যে, সে কেমন আছে এইটুকু জানতে শুধু। একদিন বিকেলে আমাকে কল করে জানালো, পেশেন্ট সুস্থ আছে এবং আমাকে দেখতে চায়! আমি তো শুনে অবাক! আমাকে দেখতে চাইবে কেন! যাই হোক, গেলাম দেখা করতে। বাবা-মাসহ সবার সাথে পরিচিত হলাম। আমি বললাম যে, মানবিকতা থেকে আমি রক্ত দিয়েছি আপনারা এতকিছু না বললেও চলবে। উনারা তো ছাড়ছেই না। সে কি এক অবস্থা! শুধু কথা একটাই আমি খুব ইমারজেন্সি মোমেন্টে ব্লাড দিয়েছি।

রোগীর পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। যাই হউক, পরদিন থেকে সিমি আমাকে ফোন করা শুরু করলো, শুরুতে হাই হ্যালো একটু একটু করে কথা চলতে থাকে। কিছুদিন পর সে জানালো আমার জন্য সে কিছু করতে চায়! আমি বললাম, আমি প্রতিদান এর জন্য কিছু করিনি আর আমি প্রতিদানও চাই না কারো কাছ থেকে। একদিন হঠাৎ সে জানালো, শী ওয়ান্টস মী ফর লাইফ টাইম! এজ এ সউল মেট! আমি আকাশ থেকে পরলাম। এক পর্যায়ে আমারদের রিলেশনশীপ হয়। তবে কিছু ভুল বুঝাবুঝির কারনে তা একদিন ভেঙ্গেও যায়।
মাস খানেক পরের কথা। ওকে দেখেছিলাম লাল রঙের একটা প্রিমিও তে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে, দুহাত ভর্তি ম্যাচিং করা চুড়ি, ড্রাইভ করছে আমার থেকেও বেশি সুন্দর একজন মানুষ। দুজনের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে শুধু একটা বাকা হাসি আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হয়ে বাতাসে মিশে গেল।

রক্তদাতাঃ মোঃ আসিফ উর রহমান অভিজ্ঞতাঃ ১০০ (সূচিপত্র)

ধরুন আপনার একটা ছোট ভাই বা বোন হবে। অপারেশনের ঠিক আগে আপনার মায়ের জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হলো। রক্ত না পেলে ভয়াবহ কিছু একটা হতে পারে। সেই সময়ের তীব্র আতংকের অনুভূতিটা কি কল্পনা করতে পারেন? কিংবা শুনলেন আপনার আব্বু বা ভাই রোড এক্সিডেন্ট করে হসপিটালে, প্রয়োজনীয় রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না, আপনি রক্তের জন্য ছুটাছুটি করছেন পাগলের মত। কিন্তু নেই, রক্ত নেই কোথাও।

প্রতিদিন কতশত রক্তের পোস্ট আমাদের চোখে পরে, আমরা বেশির ভাগই হয়তো স্কিপ করে যাই। অথচ সেটা আমাদের আপন কারো জন্য হলে তখন আমাদের কি অবস্থা হত সেটা অনুভব করি না। বড়জোর লাইক/শেয়ার দেই। ফেসবুকের এক গুতায় লাইক শেয়ার দেয়া, আর নিজে গিয়ে রক্ত দেয়ার মধ্যে অনেক অনেক ফারাক।

আমি যেদিন প্রথম রক্ত দিতে গেলাম, আমাকে প্রায় ঘন্টা খানেক ভয়াবহ জ্যাম ঠেলে বাসে দাঁড়িয়ে ঝুলে যেতে হয়েছিলো হসপিটালে। একদমই অচেনা এলাকায় অচেনা মানুষের জন্য গিয়েছিলাম। সেদিন আবার ছিলো রোজা! ডাক্তার কিছুতেই না খাওয়া অবস্থায় রক্ত দিতে দিবেন না। আমারো রোজা ভাঙ্গার ইচ্ছা নেই। অতঃপর মিথ্যে বলেই রক্ত নিতে রাজি করালাম। ডাক্তার তখন একটু ভয় দেখালেন।

হুম, ভয় লাগাটা স্বাভাবিক। রক্ত দিলে যদি কোন সমস্যা হয়? যদি মাথা ঘুরে পরে যাই? ওরে বাবা কত্ত মোটা সুই! যদি রগ খুঁজে না পায়? হায় আল্লাহ! এত্ত বড় ব্যাগ ভর্তি রক্ত নিয়ে যাচ্ছে? আমার কি হবে? আচ্ছা, রক্ত দিচ্ছি, রোজা ঠিক থাকবে তো? নাকি রোজা রেখে পরে বিপদে পড়বো আরো বড়?

ভয় পাওয়ার কারণের অভাব নাই। কিন্তু সব ভয়কে জয় করার একটাই উপায়, নিজের ভিতরের কঠোর পৌরুষ টুকু কে বের করে আনা! হুহ, হাফ লিটার রক্ত! আমার শরীরে আরো আট লিটার আছে! কিচ্ছু হবে না আমার।

মোটা সুই? এই টুকু ব্যাথায় আমার কি হবে? আমার দুই হাতে দুবার ফুটা করতে হয়েছিলো! আমি সুই ফুটানোর সময় তাকিয়ে ছিলাম।

আর রক্ত দেয়ার পর দৌড় ঝাপ না করে যাস্ট রেস্ট নিন। ধীরে ধীরে উঠুন, বসুন,হাঁটুন। যাস্ট বি কুল। তাহলেই কোন মাথা ঘুরানোর ব্যাপার হবে না। আর এক ব্যাগ রক্তের জলীয় অংশ ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ফিলাপ হয়ে যায়।

রোজা রেখে রক্ত দেয়াতে কোন বাধা নেই। এর নানা রকম রেফারেন্স দেয়া যাবে বাট কমন সেন্স খাটালে বুঝা যায় ইসলাম ধর্মে এত ভালো একটা কাজে কোন বাধা থাকতে পারে না :)

রক্ত দেয়ার আগ পর্যন্তই যা ভয়। একবার দেয়া হয়ে গেলে তখন দেখবেন কি অসাধারণ একটা ভালোলাগা কাজ করে! আপনার একটু কষ্টে একটা মানুষের জীবন বেঁচে গেলো- এর চেয়ে অসাধারণ অনুভুতি আর কি হতে পারে?

এতগুলো কথাবলার একটাই উদ্দেশ্য- আপনাদের একটু অলসতা বা একটু সংকোচের কারণে যেন একজন মানুষের জীবন সংশয়ে না পড়ে! গতর খাটিয়ে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসাটা খুব সহজ কাজ না, তাই একটু উদ্যোগী হতে হবে। রক্তের পোস্ট গুলো স্কিপ না করে ঠান্ডা মাথায় পড়ুন, কোন ভাবে হেল্প করতে পারেন কিনা ভাবুন। যারা রক্ত নিয়ে অনলাইন অফলাইনে কাজ করছেন তাদের কাছে নিজের রক্তের গ্রুপ আর এরিয়া বলে রাখুন। যাতে প্রয়োজনে আপনার সাহায্য চাওয়া যায়।

সবাই ভালো থাকুন। রক্ত দিন জীবন বাঁচান। হ্যাপি ব্লাড ডোনেটিং। ধন্যবাদ :)

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান